২৫
ছোটদের
২৫টি
মজার গল্প
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছোটদের

২৫টি মজার গল্প

ছোটদের

২৫টি মজার গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

25TI MAZAR GALPO

by

Shirsendu Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪২৪, ১৫ এপ্রিল ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৯
প্রচ্ছদ : সুমন ◆ অলংকরণ : শুভ্রা
প্রকাশক : শংকর মণ্ডল
দীপ প্রকাশন, ২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা—৭০০ ০০৬
মুদ্রক : কল্পনা অফসেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা—৭০০ ০১৫

ভূমিকা

আমি ছোটোদের জন্য সবসময় মজার গল্পই লিখি। সেইসব মজাকে কেন্দ্র করেই অনেক সময় ভূত আসে, রহস্য আসে কিংবা কল্পবিজ্ঞানের অবতারণা হয়। আসলে আমার শৈশবে কল্পনার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বিটকেল ব্যাপারস্যাপার। নানান অদ্ভুত, কিম্ভূত, বিচিত্র সব অনুষঙ্গ আমার মাথায় ভর করত সবসময়। তারই নানান বিচ্ছুরণ প্রকাশ পেয়েছে এইসব রচনায়। ভালো—মন্দ জানিনা, আমার মাথায় যা ভর করে তাই লিখি। তাই লিখেছি। আমার সেই বিচিত্র অভিযাত্রায় যদি একালের ছোটোরাও আমার সঙ্গী হয়— তাহলে তো চমৎকার!

দীপ প্রকাশন ছোটোদের জন্য আমার লেখা গল্পগুলিকে নিয়ে কয়েকটি বই প্রকাশ করতে চলেছেন। ওঁদের ধন্যবাদ। আর ভালোবাসা জানাই, আমার দীর্ঘদিনের স্নেহাস্পদ তরুণ কবি শ্রী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যে এই গল্পগুলিকে খুঁজেপেতে জোগাড় করেছে।

সূচিপত্র

বাঘের দুধ

তদানীন্তনবাবুর যে বাঘের সঙ্গে দিব্যি খাতির, তা লোকে জানে। খাতির মাগনা হয়নি। একবার নাকি পাতানাতা খুঁজতে ভুটভুটের জঙ্গলে ঢুকে ভারি ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। কানাওলা নামে একরকম ভূত আছে, তারা এমনিতে ফট করে কারও সামনে আসে না কিংবা শব্দ—সাড়াও করে না। তাদের কাজ হল মানুষের মগজে ঢুকে স্রেফ তার কাপাসটাকে অকেজো করে দেওয়া। ব্যস, সেই লোক আর কিছুতেই চেনা রাস্তাও চিনতে পারবে না, নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে দশবার যাতায়াত করেও বাড়ি ঠাহর করতে পারবে না, একেবারে ভজঘট্টে ব্যাপার বাধিয়ে দেবে। তা ভুটভুটের জঙ্গলে তেমনধারা কানাওলা বিস্তর ছিল। তদানীন্তনবাবু পড়লেন তারই একটার পাল্লায়। জঙ্গল থেকে আর কিছুতেই বেরোতেই পারেন না। ওদিকে অন্ধকারও নেমে এল। আর সেই আমলে ডুয়ার্স ছিল এক উদ্ভুটে জায়গা। ভূতপ্রেত দত্যিদানা তো ছিলই, আর ছিল বিস্তর বাঘ, হাতি, গন্ডার, বুনো শুয়োর, সাপখোপের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। আর কে না জানে, জঙ্গলের মধ্যে সন্ধেবেলার চেয়ে ভয়ের সময় আর নেই।

তদানীন্তনবাবু তখন ছোকরা মানুষ। সবে কবরেজিতে পসার হতে শুরু করেছে। ডাক্তার—কবরেজদের এই শুরুর দিকটাই যা বিপদের। প্রথম দিকেই দু—চারটে ভোজবাজি দেখিয়ে দিতে পারলে রুগির একেবারে গাদি লেগে যায় চেম্বারে। পসার হয়ে যাওয়ার পর রুগি মরলেও আর কেউ কিছু মনে করে না। যে—ক'টা ভালো হয়, সেগুলোর কথাই লোকে ফলাও করে বলে বেড়ায়। তা তদানীন্তনবাবু গোটা দুয়েক ভোজবাজি ইতিমধ্যে দেখিয়েছেনও। মহাজন রামপ্রসাদের পেটে একটা টিউমার হয়েছিল। ডাক্তার বলেছে, অস্ত্র করতে হবে। রামপ্রসাদ অস্ত্র করার নামে এমন ভয় খেয়ে গেল যে, তার নাওয়া—খাওয়া বন্ধ হল। সেই টিউমার শেষে কমল তদানীন্তনের দেওয়া ওষুধে। রামপ্রসাদ খুশি হয়ে বলল, 'তোমাকে কত দিতে হবে বলো, যা চাও তা—ই দেব।' কিন্তু লোভ তদানীন্তনের ধাতেই নেই। তার ওপর গুরুর বারণ আছে, চিকিৎসা মানে লোকসেবা, লোভ করতে যেয়ো না বাপু। তদানীন্তন তাই দুটি টাকা আর ওষুধের দামটুকু নিয়েছিলেন। এতে সবাই বেশ বাহবা দিল তাঁকে।

এরপর হেড পণ্ডিতের বউয়ের ভূতে ধরার ঘটনা। সে এক বিদঘুটে ব্যাপার। পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নি রাখালরানি মহা খান্ডার। তাঁর ভয়ে বাড়ির বেড়ালটা অবধি তটস্থ। অমন যে দাপটের পণ্ডিতমশাই, যাঁর ভয়ে ছাত্ররা একেবারে ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকে, সেই—হেন পণ্ডিতমশাই রাখালরানির কথায় ওঠেন বসেন। রাখালরানিকে যে ভূতেরাও ধরার সাহস রাখে, এটাই আশ্চর্যের বিষয়। তবু ধরল, সবাইকে অবাক করে দিয়েই ধরল। আর কী ধরা বাপ। সাঁঝবেলায় পুকুরঘাটে গা ধুতে গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন অন্য মানুষ। এক গলা ঘোমটা, নববধূর মতো হাবভাব, কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ ফুচফুচ করে কাঁদতে থাকেন। আবার যখন—তখন খিলখিল করে হেসে ওঠেন। অদৃশ্য সব মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। গলা ছেড়ে বিদঘুটে সব গান গাইতে লাগলেন। একদিন দিনে—দুপুরে একটা মোষের পিঠে চেপে খানিকটা ঘুরে এলেন। এইসব কাণ্ড দেখে ডাক্তার—বদ্যি ডাকা হল। তারা ফেল মারলে ডাকা হল ওঝা। রাজ্যের লোক ভেঙে পড়ল কাণ্ডটা দেখতে। ওঝা যখন হার মেনে চলে গেল, তখন তদানীন্তনবাবুর ডাক পড়ল।

তা তদানীন্তনের কপাল ভালোই বলতে হবে। খুঁজেপেতে লাগসই গাছগাছড়া পেয়ে ওষুধ বানিয়ে ফেললেন। আর তা লেগেও গেল। সাতদিনের মধ্যে রাখালরানি আবার সেই আগের মতোই খান্ডারনি হয়ে উঠলেন। তদানীন্তনের বেশ নাম হল। শুধু কে জানে কেন, পণ্ডিতমশাই বিশেষ খুশি হলেন না। কেবল

বলতে লাগলেন, 'কবিরাজ না কপিরাজ, হুঃ, উনি আবার চিকিৎসা করবেন, লোকচরিত্রই জানে না লোকটা! কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সেই জ্ঞানই হয়নি।'

তৃতীয় যে রুগি হাতে এল, তিনি বলতে গেলে এলাকাটার রাজা। শোনা যায়, নরহরিবাবুর একসময়ে নাম হয়েছিল থরহরি বলে। তা কথাটা মিথ্যেও নয়। নরহরি প্রথম জীবনে ডাকাতি করতেন। তাঁর হাতে মেলা লোক মরেছে, মেলা লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে। যথেষ্ট টাকাপয়সা হাতে এসে যাওয়ার পর নরহরি ডাকাতি ছেড়ে ব্যবসাতে মন দিলেন, জমি—জায়গাও কিনে ফেললেন বিস্তর। তাতে অবস্থাটা ফুলে—ফেঁপে উঠল, খুব নামডাকও হল। এখন উনি ডাকাতি করেন না বটে, কিন্তু হাতে মাথা কাটেন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ। একদিন তদানীন্তনকে ডেকে পাঠালেন দরবারে। বিশাল ঘর, ঝাড়বাতি, কিংখাব, কী নেই সেই ঘরে! তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তদানীন্তনকে বললেন, 'দ্যাখো হে বাপু, ইদানীং মনে হচ্ছে আমি কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার কাছে। এত টাকাপয়সা, ধনদৌলত, আমি বুড়ো হলে ভোগ করবে কে? অ্যাঁ! বুড়ো হব মানে? এ কী ইয়ার্কি নাকি? এখনও তেমন বয়সই হল না, বুড়ো হলেই হল? তা তোমাকে এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে...'

শুনে তদানীন্তন মাথা চুলকোলেন। বুড়ো হওয়াটা কোনো রোগ নয়, তবে অকালবার্ধক্য হলে অন্য কথা। তিনি যতদূর শুনেছেন, নরহরির বয়স সত্তরের ওপর, চুলে এখনও পাক ধরেনি, শরীরটাও টানটান আছে। একখানা ছোটোখাটো পাঁঠা, আস্ত কাঁঠাল বা সেরটাক রাবড়ি হাসতে হাসতে খেয়ে ফেলতে পারেন। কিলিয়ে পাথর ভাঙা নরহরির কাছে এখনও কিছু নয়। কিন্তু তা বলে তো আর জরা—বুড়ি ছাড়বে না। সে একদিন ধরবেই মানুষকে।

তদানীন্তনকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে নরহরি বললেন, 'দ্যাখো হে, রোগটা যদি সারাতে পারো তো তোমাকে আর ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হবে না। রাজা করে দেব। আর যদি না পারো তবে কী হবে, সেটা উহ্য থাক...'

তদান্তীন্তন বুঝলেন।

বুড়ো—হওয়া ঠেকানোর ওষুধ যে নেই, তা নয়। তবে বেশিরভাগ লোকই এটাকে রোগ বলে মনে করে না, চিকিৎসাও করাতে আসে না। আর ওষুধ জোগাড় করাও বেশ শক্ত। বাঘের দুধ, ব্রহ্মকমলের বীজ এবং আরও নানা দুষ্প্রাপ্য জিনিস লাগবে।

তদানীন্তন বললেন, 'দেখি।'

'দ্যাখো, বেশ ভালো করে দ্যাখো। এইটে তোমার অগ্নিপরীক্ষা, এই কথাটা মনে রেখেই কাজ কোরো বাপু।'

'যে আজ্ঞে।'

এটা যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি তা বুঝতে কষ্ট হল না তদানীন্তনের। ভারি চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। তবে তিনি এটাও জানেন যে, নরহরির চিকিৎসা যদি লেগে যায়, তা হলে পসারের জন্য আর ভাবতে হবে না।

ভাবতে ভাবতে তদানীন্তন শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। রোজ সকালে নরহরির দুটো যমদূতের মতো পাইক সড়কি হাতে এসে হেঁড়ে গলায় হাঁক মারে, 'কই কবরেজমশাই ওষুধ জোগাড় হল? বাবু যে হেঁদিয়ে পড়লেন। রোজ রাতে পনেরোখানা পরোটা খান, কাল রাতে চোদ্দোর বেশি পারেননি। যা করার তাড়াতাড়ি করুন।'

তদানীন্তন কবিরাজ অমায়িকভাবে বলেন, 'হচ্ছে বাবারা, হচ্ছে।'

তা দৌড়ঝাঁপ করে, নানা ফন্দিফিকির খাটিয়ে, কিছু কিছু জিনিস পেয়েও গেলেন তদানীন্তন। এখন বাঘের দুধটা হলেই হয়। কিন্তু সেটা কি হবে? কথাতেই আছে 'বাঘের দুধ'। অভাবে গোরু বা মোষের দুধ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হবে না।

তা সে যা—ই হোক, নানা ভাবনাচিন্তায় পড়ে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে বেঘোরে তো অন্ধকার নেমে এল। চারদিকে নানারকম জন্তু—জানোয়ারের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। তদানীন্তন অগত্যা একটা বেশ বড়ো গাছে উঠে পড়লেন। বিশ হাত মতো উঠে তিনটে শাখার সংযোগস্থলে দিব্যি একটা রাত কাটানোর মতো ফাঁদালো জায়গাও জুটে গেল। সেখানে বসে বসে আকাশ—পাতাল ভাবতে লাগলেন। পেটে খিদে, শরীরটার ওপর দিয়ে ধকলও গেছে কম নয়। তার ওপর কাঠপিঁপড়ে আর মশার কামড়েও জ্বালাতন হচ্ছেন।

ক্রমে রাত বেশ নিশুতি হয়ে এল। তদানীন্তনের একটু ঢুলুনি এসেছিল। হঠাৎ শুনলেন, গাছের তলায় কীসের যেন শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন কান্নাকাটি করছে বলে মনে হল। তবে মানুষ নয়।

তদানীন্তন অন্ধকারে ভালো দেখতে পাচ্ছিলেন না বলে একটু ঝুঁকলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর ঘাড়ে একটা ধাক্কা মেরে টালমাটাল করে দিল।

হড়াস করে তদানীন্তন গাছ থেকে পড়লেন। তবে সোজাসুজি নয়। সোজা পড়লে ঘাড় ভেঙে যেত নির্ঘাত। ডালপালায় আটকে এবং গোঁত খেয়ে খেয়ে যখন নীচে এসে পড়লেন, তখন ঘাড় না হোক হাড়পাঁজর কিছু—না—কিছু ভাঙারই কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভাঙা তো দূরের কথা, ব্যথাটুকুও টের পেলেন না তিনি।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থেকে হঠাৎ বোঁটকা গন্ধটা পেলেন। আঁতকে উঠে দেখলেন— যা দেখলেন, তা প্রত্যয় হল না।

একটা বিশাল বাঘ। বাঘ যে এতবড়ো হয়, তা ধারণাতেই ছিল না তদানীন্তনের। লেজ থেকে মাথা অবধি বোধহয় হাত দশেক হবে। উঁচুও একটা বড়ো মোষের সমান। বাঘটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর একটা অদ্ভুত শব্দ করে গোঙানি ছাড়ছে।

এরকম অবস্থায় তদানীন্তন আর পড়েননি কখনো। শত্রুও যেন না পড়ে।

কিছুক্ষণ বিস্ময়ভরে বাঘটার দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর কানে তাঁর বিবেক যেন বলে উঠল, 'তুমি না চিকিৎসক। চিকিৎসক কী রুগি বাছে? জীব কষ্ট পাচ্ছে, তোমার কাজ তুমি করো।'

তদানীন্তনের ভিতরের সুপ্ত কবিরাজটি জেগে উঠল। তিনি যন্ত্রণাকাতর বাঘটার কাছে নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, তদানীন্তন একটু চেষ্টা করতেই বাঘটার সামনের ডান পায়ের থাবার কিছু ওপরে নাড়িটাও টের পেলেন। বেশ চঞ্চল নাড়ি। বুঝতে পারলেন, বাঘটার পিত্ত কুপিত হয়েছে। বাঘটা হাহা করে হাঁফাচ্ছিল, আর জ্যোৎস্নাটাও নিশুতরাতে বেশ জোরালো হয়ে পড়েছে বলে জিভ পরীক্ষা করতেও বেগ পেতে হল না। চোখ টেনে চোখের কোলটাও পরীক্ষা করে নিলেন।

জঙ্গলে গাছগাছড়ার অভাব নেই। মোক্ষম ওষুধটি খুঁজে বের করতে কষ্টও হল না। এনে খাইয়ে দিলেন। বাঘটাও, আশ্চর্যের বিষয়, খেল।

তারপর বাঘটা একটু আরাম বোধ করে শুয়ে পড়ল। তদানীন্তন তার পিঠ চুলকে দিলেন। কানে সুড়সুড়ি দিলেন। বাঘটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

এরপর বাঘের দুধ জোগাড় করতে আর কষ্ট পেতে হয়নি তাঁকে।

লোক দেখেছে, সন্ধেবেলা বাঘটা এসে তদানীন্তনের গোয়াল—ঘরে ঢুকত, আর তদানীন্তন বালতি নিয়ে গিয়ে সের সের দুধ দুইয়ে নিতেন। লোকে বলে, সেই দুধ থেকে ছানা, দই, এমনকী ঘি অবধি তৈরি করতেন তদানীন্তন। নিজে তো খেতেনই, চড়া দামে বিক্রিও করতেন।

কিন্তু যে কথাটা বলার জন্য এই এত কথা, তা হল নরহরিকে নিয়ে।

তদানীন্তনবাবু তো বাঘের দুধ ও আর সব দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়ে বার্ধক্য ঠেকানোর ওষুধ তৈরি করলেন। তারপর গিয়ে হাজির হলেন নরহরির দরবারে।

নরহরি ওষুধের শিশিটা খুলে নাকের কাছে ধরে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এঃ, বিচ্ছিরি গন্ধ। এতে কাজ হবে তো হে কবরেজ? নইলে কিন্তু...'

কাজ হল কি না, তা ঠিক বোঝা গেল না।

তবে ক—দিন বাদে একদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা। তদানীন্তন তাঁর গাছগাছড়ার খোঁজে যাচ্ছিলেন। আর ঘোড়া দাপিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন নরহরি।

একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন।

'এই যে কবরেজ! কী খবর?'

তদানীন্তন তটস্থ হয়ে বললেন, 'যে আজ্ঞে। খবর ভালোই। তা আপনাকে বেশ ছোকরা ছোকরা দেখাচ্ছে কিন্তু।'

এ—কথায় হঠাৎ ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামলেন নরহরি। তারপর গাঁক—গাঁক করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এ—কথাটা আজকাল আমাকে সবাই বলে কেন বলো তো! এ কি ইয়ার্কি নাকি?'

'আজ্ঞে না, ইয়ার্কি হবে কেন? যথার্থই বলে।'

নরহরি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'ইয়ার্কি পেয়েছ। ছোকরা দেখালেই হল? বয়স কত হয়েছে তা খেয়াল আছে? একাত্তর ছাড়িয়ে বাহাত্তরে পড়লুম, আর ছোকরা দেখাবে মানে? বয়সের গাছপাথর নেই, তা জানো? ওসব কবরেজি একদম করবে না আমার কাছে। বুড়োবয়সে বুড়ো হওয়াটাই ধর্ম, বুঝলে? ছোকরা দেখানোটা কাজের কথা নয়।'

'যে আজ্ঞে।'

'চুলে পাক ধরেছে, দেখেছ? কশের দাঁত পড়েছে, জানো? আজকাল দশখানা পরোটার বেশি খেতে পারি না, খবর রাখো?'

'আজ্ঞে না।'

'খুব কবরেজ হয়েছে! পণ্ডিত ঠিকই বলে, কবিরাজ না কপিরাজ।' এই বলে ফের ঘোড়া ছোটালেন নরহরি।

তদানীন্তন হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

রাজার মন ভালো নেই

রাজার মন আর কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। মন ভালো করতে লোকেরা কম মেহনত করেনি। রাজাকে গান শোনানো হয়েছে, নাচ দেখানো হয়েছে, বিদূষক এসে হাজার রকমের ভাঁড়ামি করেছে, যাত্রা, নাটক, মেলা—মচ্ছব, যাগ—যজ্ঞ পুজো—পাঠ সব হল। পুবের রাজ্য থেকে আনারস, উত্তরের হিমরাজ্য থেকে আপেল, পশ্চিম থেকে আখরোট, আঙুর, পেস্তা বাদাম, দেশ—বিদেশ থেকে ক্ষীর আর ছানার মিষ্টি এনে খাওয়ানো হয়েছে। এখন সাহেব আর চীনে রসুইকররা দু—বেলা হরেক খাবার বানাচ্ছে। রাজা দেখছেন, শুনছেন, খাচ্ছেন, কিন্তু তবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুক কাঁপিয়ে হুহুংকারে এক—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। 'না হে, মনটা ভালো নেই।'

রাজবৈদ্য এসে সারাদিন বসে নাড়ি টিপে চোখ বুজে থাকেন। নাড়ি কখনো তেজি, কখনো মরা, কখনো মোটা, কখনো সরু। রাজবৈদ্য আপনমনে হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ করেন, তারপর শতেকরকম শেকড়—বাকড় পাতা বেটে ওষুধ তৈরি করে শতেক অনুপান দিয়ে রাজাকে খাওয়ান। রাজা খেয়ে যান। তারপর হড়াস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। 'না হে, মনটা ভালো নেই।'

রাজার মন ভালো করতে রাজপুত্তুর আর সেনাপতিরা আশপাশের গোটা দশেক রাজ্য জয় করে হেরো রাজ্যগুলোকে বন্দি করে নিয়ে এল। রাজা তাকিয়ে দেখলেন। তারপরই অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। 'মনটা বড়ো খারাপ রে।'

তখন মন্ত্রীমশাই রাজার তীর্থযাত্রা আর দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। লোকলশকর পাইক—পেয়াদা নিয়ে রাজা শ—দেড়েক তীর্থ আর দেশ—দেশান্তর ঘুরে এসে হাতমুখ ধুয়ে সিংহাসনে বসেই বললেন, 'হায় হায়। মনটা একদম ভালো নেই।'

ওদিকে ভাঁড়ামি করে করে রাজার বিদূষক হেদিয়ে পড়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রাজনর্তকীর পায়ে বাত। সভাগায়কের গলা বসে গেছে। বাদ্যকরদের হাতে ব্যথা। রসুইকররা ছুটি চাইছে। রাজবৈদ্যকে ধরেছে ভীমরতি। সেনাপতি সন্ন্যাস নিয়েছেন। মন্ত্রীমশাইয়ের মাথায় একটু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী সন্দেহ করছেন। রাজ—পুরোহিত হোম—যজ্ঞে এত ঘি পুড়িয়েছেন যে, এখন ঘিয়ের গন্ধ নাকে গেলে তাঁর মূর্ছা হয়। প্রজাদের মধ্যে কিছু অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। সভাপণ্ডিতরা রাজার মন খারাপের কারণ নিয়ে দিনরাত গবেষণা করছেন। রাজজ্যোতিষী রাজার জন্মকুণ্ডলী বিচার করতে করতে, আঁক কষে কষে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরিয়ে ফেলেছেন।

একদিন বিকেলে রাজা মুখখানা শুকনো করে রাজবাড়ির বিশাল ফুল—বাগিচায় বসে আছেন। চারদিকে হাজারও রকমের ফুলের বন্যা, রঙে গন্ধে ছয়লাপ। মৌমাছি গুনগুন করছে, পাখিরা মধুর স্বরে ডাকছে। সামনের বিশাল সুন্দর দিঘিতে মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউ খেলছে, রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে।

রাজা চুপচাপ বসে থেকে থেকে হঠাৎ সিংহগর্জনে বলে উঠলেন, 'গর্দান চাই।'

মন্ত্রী পাশেই ছিলেন, আপনমনে বিড়বিড় করছিলেন, মাথা খারাপের লক্ষণ। রাজার হুংকারে চমকে উঠে বললেন, 'কার গর্দান মহারাজ?'

রাজা লজ্জা পেয়ে বলেন, 'দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। হঠাৎ মনে হল কার যেন গর্দান নেওয়া দরকার।'

মন্ত্রী বললেন, 'ভাবুন মহারাজ, আর একটু কষে ভাবুন। মনে পড়লেই গর্দান এনে হাজির করব।'

বহুকালের মধ্যেও রাজা কিছুই মুখ ফুটে চাননি। হঠাৎ এই গর্দান চাওয়ায় মন্ত্রীর আশা হল, এবার রাজার মনোমতো একটা গর্দান দিলে বোধ হয় মন ভালো হবে। রাজ্যে গর্দান খুবই সহজলভ্য।

পরদিন সকালে রাজসভার কাজ শেষ হওয়ার পর রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'না হে, গর্দান নয়। গর্দান চাই না। অন্য কী একটা যেন চেয়েছিলাম, এখন আর মনে পড়ছে না।'

বিকেল বেলা রাজা প্রাসাদের বিশাল ছাদে পায়চারি করছিলেন। সঙ্গে রাজকীয় কুকুর, তাম্বুলদার, হুক্কাদার, মন্ত্রী। পায়চারি করতে করতে রাজা হঠাৎ নদীর ওপারের গ্রামের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বুড়ির ঘরে আগুন দে! দে আগুন বুড়ির ঘরে।'

মন্ত্রীর বিড়বিড় করা থেমে গেল। রাজার সুমুখে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'জো হুকুম মহারাজ। শুধু বুড়ির নামটা বলুন।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'কী বললাম বলো তো!'

'আজ্ঞে, এই যে বুড়ির ঘরে আগুন দিতে বললেন।'

রাজা ঘাড় চুলকে বললেন, 'বলেছি নাকি? আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।'

সেইদিনই শেষ রাতে রাজা ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন, 'বিছুটি লাগা। শিগগির বিছুটি লাগা।'

পরদিনই খবর রটে গেল, রাজা বিছুটি লাগাতে বলেছেন। আতঙ্কে সবাই অস্থির।

মন্ত্রী রাজার কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ! কাকে বিছুটি লাগাতে হবে তার নামটা একবার বলুন, বিছুটি আনতে পশ্চিমের পাহাড়ে লোক পাঠিয়েছি।

'বিছুটি!' বলে রাজা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়ল। গোরুর গাড়ি বোঝাই বিছুটি এনে রাজবাড়ির সামনের অঙ্গনে জমা করা হয়েছে। রাজার সেদিকে মন নেই।

রাজা রঙ্গঘরে বসে বয়স্যদের সঙ্গে ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলছেন। মুখ গম্ভীর, চোখে অন্যমনস্ক একটা ভাব। বয়স্যরা ভয়ে ভয়ে ভুল চাল দিয়ে রাজাকে জিতবার সুবিধে করে দিচ্ছেন। কিন্তু রাজা দিচ্ছেন আরও মারাত্মক ভুল চাল।

খেলতে খেলতে রাজা একবার গড়গড়ার নলে মৃদু একটা টান দিয়ে বললেন, 'পুঁতে ফেললে কেমন হয়?'

মন্ত্রী কাছেই ছিলেন। বিড়বিড় করা থামিয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'খুব ভালো হয় মহারাজ। শুধু একবার হুকুম করুন।'

রাজা আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'কীসের ভালো হয়? কিছুতেই ভালো হবে না মন্ত্রী। মনটা একদম খারাপ।'

মন্ত্রী বিমর্ষ হয়ে আবার বিড়বিড় করতে লাগলেন।

পরদিন রাজা শিকারে গেলেন। সঙ্গে বিস্তর লোকলশকর, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, রথ। বনের মধ্যে রাজার শিকারের সুবিধের জন্যই হরিণ, খরগোশ, পাখি ইত্যাদি বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। একটা বাঘও আছে। রাজা ঘোড়ার পিঠে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কিন্তু একটাও তির ছুড়লেন না। দুপুরে বনভোজনে বসে পোলাও দিয়ে মাংসের ঝোল মেখে খেতে খেতে বলে উঠলেন, 'বাপ রে! ভীষণ ভূত!'

মন্ত্রীমশাই সঙ্গে সঙ্গে মাংসের হাত মাথায় মুছে উঠে পড়লেন। রাজামশাইয়ের সামনে এসে বললেন, 'তাই বলুন মহারাজ! ভূত! তা তারই—বা ভাবনা কী? ভূতের রোজাকে ধরে আনাচ্ছি, রাজ্যে যত ভূত আছে ধরে ধরে সব শূলে দেওয়া হবে।'

রাজা হাঁ করে রইলেন। বললেন, 'ভূত। না না ভূত নয়। ভূত হবে কী করে? ভূতের কি কখনো মাথা ধরে?'

মন্ত্রীমশাই আশার আলো দেখতে পেয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'মাথা ধরলেও বদ্যি—ভূত আছে। তারা ভূতের ওষুধ জানে।'

রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি ভূতের কথা ভাবছি না। মনটা বড়ো খারাপ।'

কয়েকদিন পর রাজা এক জ্যোৎস্না রাতে অন্দরমহলের অলিন্দে রানির পাশাপাশি বসেছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'চলো রানি, চাঁদের আলোয় বসে পান্তাভাত খাই।'

রানি তো প্রথমে অবাক। তারপর তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী এসে হাতজোড় করে বললেন, 'তা এ আর বেশি কথা কী? ওরে, তোরা সব পান্তাভাতের জোগাড় কর।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'পান্তাভাত? পান্তাভাতটা কী জিনিস বলো তো?'

'জলে ভেজানো ভাত মহারাজ, গরিবরা খায়। কিন্তু আপনি নিজেই তো পান্তাভাতের কথা বললেন।'

'বলেছি! তা হবে। কখন যে কী বলি, মনটা ভালো নেই তো, তাই।'

মন্ত্রীমশাই ফিরে গেলেন। তবে সেই রাত্রেই তিনি রাজ্যের সবচেয়ে সেরা বাছা বাছা চার জন গুপ্তচরকে ডেকে বললেন, 'ওরে তোরা আজ থেকে পালা করে রাজামশাইয়ের ওপর নজর রাখবি। চব্বিশ ঘণ্টা।'

পরদিনই এক গুপ্তচর এসে খবর দিল, 'রাজামশাই ভোর রাত্রে বিছানা থেকে নেমে অনেকক্ষণ হামা দিয়েছেন ঘরের মেঝেয়।'

আর একজন বলল, 'রাজামশাই একা—একাই লাল জামা নেব, লাল জামা নেব, বলে খুঁতখুঁত করে কাঁদছেন।'

আর একজন এসে খবর দিল, 'রাজামশাই এক দাসীর বাচ্চচা ছেলের হাত থেকে একটা মণ্ডা কেড়ে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন, এইমাত্র।'

চতুর্থ জন বলল, 'আমি অতশত জানি না, শুধু শুনলাম রাজামশাই খুব ঘন ঘন ঢেঁকুর তুলছেন আর বলছেন সবই তো হল, আর কেন?'

মন্ত্রীর মাথা আরও গরম হল। তবু বললেন, 'ঠিক আছে, নজর রেখে যা।'

পরদিনই প্রথম গুপ্তচর এসে বলল, 'আজ্ঞে, রাজামশাই আমাকে ধরে ফেলেছেন। রাত্রে শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে যেই উঁকি দিয়েছি, দেখি রাজামশাই আমার দিকেই চেয়ে আছেন। দেখে বললেন, 'নজর রাখছিস? রাখ বলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।'

দ্বিতীয় জন এসে বলে, 'আজ্ঞে আমি ছিলাম রাজার খাটের তলায়। মাঝরাতে রাজামশাই হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমাকে বললেন, কানে কেন্নো ঢুকবে, বেরিয়ে আয়।'

তৃতীয় জন কান চুলকে লাজুক লাজুক ভাব করে বলল, 'আজ্ঞে আমি বিকেলে রাজার কুঞ্জবনে রাজার ভুঁইমালী সেজে গাছ ছাঁটছিলাম। রাজা ডেকে খুব আদরের গলায় বললেন, ওরে, ভালো গুপ্তচর হতে গেলে

সব কাজ শিখতে হয়। ওভাবে কেউ গাছ ছাঁটে নাকি? আয় তোকে শিখিয়ে দিই। বলে রাজা নিজেই গাছ ছেঁটে দেখিয়ে দিলেন।'

কিন্তু সবচেয়ে তুখোড় যে গুপ্তচর সেই রাখহরি তখনো এসে পৌঁছোয়নি। মন্ত্রী একটু চিন্তায় পড়লেন।

ওদিকে রাখহরি কিন্তু বেশি কলাকৌশল করতে যায়নি। সকালবেলা রাজার শোয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা বেরোতেই প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ, আমি গুপ্তচর রাখহরি। আপনার ওপর নজর রাখছি।'

রাজা অবাক হলেও স্মিত হাসলেন। হাই তুলে বললেন, 'বেশ বেশ, মন দিয়ে কাজ করো।'

তারপর রাজা যেখানে যান পেছনে রাখহরি ফিঙের মতো লেগে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত বেশ কাটল। দুপুরে খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে রাজা হঠাৎ বললেন, 'চিমটি দে। রাম চিমটি দে।'

সঙ্গে সঙ্গে রাখহরি রাজার পেটে এক বিশাল চিমটি বসিয়ে দিল। রাজা আঁক করে উঠে বললেন, 'করিস কী, করিস কী? ওরে বাবা।'

রাখহরি বলল, 'বললেন যে।'

পেটে হাত বোলাতে বোলাতে রাজা কিন্তু হাসলেন।

আবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। রাজা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ল্যাং মেরে ফেলে দে।' বলতে—না—বলতেই রাখহরি ল্যাং মারল। রাজা চিতপটাং হয়ে পড়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। রাখহরি রাজার গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে দাঁড় করিয়ে রাজার পায়ের ধুলো নিল। রাজা শ্বাস ফেলে বললেন, 'হুঁ।'

রাত পর্যন্ত রাজা আর কোনো ঝামেলা করলেন না। রাখহরি রাজার পিছু পিছু শোয়ার ঘরে ঢুকল এবং রাজার সামনেই একটা আলমারির ধারে লুকিয়ে রইল। রাজা আড়চোখে দেখে একটু হাসলেন। আপত্তি করলেন না। তবে শোয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজা হঠাৎ খুঁতখুঁত করে বলে উঠলেন, 'ঠান্ডা জলে চান করব, ঠান্ডা জলে...।' রাখহরি বিদ্যুৎগতিতে রাজার ঘরের সোনার কলসের কেওড়া আর গোলাপের সুগন্ধ মেশানো জলটা সবটুকু রাজার গায়ে ঢেলে দিল।

রাজা চমকে হেঁচে কেশে উঠে বসলেন। কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না। রাখহরির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা শুগে যা।'

রাখহরি অবশ্য শুতে গেল না। পাহারায় রইল।

সকালে উঠে রাজা হাই তুলে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দে বুকে ছোরা বসিয়ে দে....।' চকিতে রাখহরি কোমরের ছোরখানা তুলে রাজার বুকে ধরল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাজা বললেন, 'থাক থাক, ওতেই হবে। তোর কথা আমার মনে ছিল না।'

রাখহরি ছোরাটা খাপে ভরতেই রাজা হো—হো করে হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে রাজবাড়ির সব লোকজন ছুটে এল। রাজা হাসতে হাসতে দু—হাতে পেট চেপে ধরে বললেন, 'ওরে আমার যে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে! ভীষণ হাসি পাচ্ছে।'

খবর পেয়ে মন্ত্রীও এসেছেন। রাজার বুকে—পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'যাক বাবা! মন খারাপটা গেছে তাহলে।'

হাসতে হাসতে রাজা বিষম খেয়ে বললেন, 'ওঃ হোঃ হোঃ। কী আনন্দ। কী আনন্দ!'

তারপর থেকে রাজার মন খারাপ কেটে গেল। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল আবার। কারণ নেই, কিছু নেই, রাজা সব সময়ে কেবল ফিক ফিক করে হেসে ফেলছেন। খুব দুঃসংবাদ দিলেও হাসতে থাকেন। যুদ্ধে হার হয়েছে? ফিক ফিক। অমুক মারা গেছে? ফিক ফিক। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে? ফিক ফিক। দক্ষিণের রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ করেছে? ফিক ফিক।

রাজার হাসি বন্ধ করার জন্য মন্ত্রীকে এখন আবার দ্বিগুণ ভাবতে হচ্ছে।

লেজ

বাসা বদলানোর পর বদ্যিনাথ কিছু ফাঁপরে পড়ে গেল। যে বাড়িতে এল সে—বাড়ি না হোক তো এক—দেড়শো বছরের পুরোনো। নতুন চুনকাম করা সত্ত্বেও নোনাধরা দেওয়ালের চুনবালি খসে পড়ছে, গত বর্ষার জলের ছাপ এখনও দেয়াল থেকে মোছেনি। তার ওপর বড্ড ঘুপচি আর অন্ধকার, আলো বাতাসের বালাই নেই। চারদিকে সব সময়ে একটা ভেজা—ভেজা ভাব। দেয়াল আর মেঝেয় হরেক রকমের ফাটল। তাতে কাঁকড়াবিছে তেঁতুলবিছের আস্তানা, এখানে—সেখানে উইয়ের সুড়ঙ্গ পথ, আরশোলা ফরফর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দিন, লুকোনো গর্ত থেকে মাঝে মাঝে একটা ব্যাঙ ডাকে। বদ্যিনাথের নব্বই বছরের বুড়ি—মা দিন—রাত ঘ্যান—ঘ্যান করছেন, 'এ কী সোঁদরবন বাবা? কোন জীবজন্তুটা নেই এখানে? ঠাকুরঘরে বাদুড় পর্যন্ত ঝুলে আছে।'

'শুধু বাদুড়?' বদ্যিনাথের গিন্নি ঘোমটা খসিয়ে বলেন, 'ভাঁড়ার ঘরের জলনিকাশি ফুটো দিয়ে একটা লেজ বেরিয়ে যেতে দেখলুম। তা সে কীসের লেজ কে জানে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বদ্যিনাথের মা বলেন, 'লেজের কথা আর বোলো না। লেজ আমি দিনরাত দেখছি। পরশু রাতে ঘুম ভেঙে মশারির গায়ে একটা কাঁটাওলা লেজ, গতকাল আহ্নিকে বসে ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে একটা লোমওলা লেজ, আজ সকালে বাইরের ঘরের চৌকির তলায় একটা লিকলিকে লেজ, আমার নিজের চোখে দেখা। তবে জন্তুগুলোকে ঠাহর করতে পারিনি।'

বদ্যিনাথের ছেলে মল্লিনাথ ছেলেবেলা থেকেই ভারি রোগা—ভোগা। ফ্যাকাশে সরু চেহারা। তার হাতে—গলায় রাজ্যের মাদুলি আর শেকড়—বাকড় বাঁধা। সে খেলে না, ছোটে না, দুষ্টুমি করে না। কাঁচকলা আর পেঁপের ঝোল দিয়ে ভাত খায় আর চুপ করে শুয়ে বসে থাকে। রোগে ভোগে বলে তার ঠাকুমা সবাইকে সাফ বলে দিয়েছেন, 'বংশের ওই একটিমাত্র সলতে। লেখাপড়ার ধকল যদি রোগা শরীরে না সয়? নাতি আমার বেঁচে থাক, লেখাপড়ার দরকার নেই।'

তাই মল্লিনাথ ইস্কুলে—পাঠশালেও যায় না। ঘরে বসে খুশিমতো একটু—আধটু পড়ে। কথাবার্তা বড়ো একটা বলে না কারও সঙ্গে। মা বা ঠাকুমার আঁচলের আড়ালে সে বড়ো হয়। মা—ঠাকুমার কথা শুনে মল্লিনাথও চিঁচি করে বলল, 'লেজ? লেজ তো আমিও দেখি। আমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ার থেকে মাঝে মাঝে একটা সবুজ রঙের ভারি সুন্দর লেজ বেরিয়ে ঝুলে থাকে।'

'কী সর্বনাশ!' মা ঠাকুমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন।

বদ্যিনাথ গরিব মানুষ হলেও রোজ ছেলের জন্য খেলনা আনে, খাবার আনে। কিন্তু ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, চোখে মড়ার দৃষ্টি জ্যান্ত হয় না। বদ্যিনাথ বল কিনে এনে হাতে দেয়, খেলনা—বন্দুক দেয়, লাট্টু দেয়, ঘুড়ি লাটাই দেয়, বলে, 'কী বাবা, একটু আনন্দ পাচ্ছ? এই দ্যাখো বল, এমনি করে পায়ে নিয়ে ছুটবে। দুম করে লাথি কষাবে, কেমন আনন্দ হবে দেখো।...ঘুড়ি কেমন শোঁ করে আকাশে ওড়ে, না বাবা? দেখেছ তো! তেমনি ওড়াবে ছাদে উঠে, দেখবে বুকখানা ভারি হালকা হবে, ফুর্তি হবে খুব। বন্দুক দিয়ে রোজ টিপ করবে। কত আরশোলা, ইঁদুর, চামচিকে চারদিকে দেখছ তো!...টিপ করে করে মারতে মারতে দেখো রক্ত গরম হয়ে উঠবে।...এই দ্যাখো লাট্টু, কেমন বনবন ঘোরে জানো?'

কিন্তু খেলনা পড়ে থাকে, খাবারও ছোঁয় না মল্লিনাথ। মাদুলির ভারে কুঁজো হয়ে চুপ করে ফ্যাকাশে মুখে বসে থাকে। তার রক্ত গরম হয় না, আনন্দ হয় না, ফুর্তি হয় না। বদ্যিনাথ তার সামনে বল খেলে দেখায়, ঘুড়ি উড়িয়ে দেখায়, লাট্টু ঘুরিয়ে দেখায়, দেখাতে দেখাতে হাঁফিয়ে ওঠে, নেতিয়ে পড়ে, চিড়বিড়োতে থাকে।

নতুন বাসায় এসে মল্লিনাথ আরও ফ্যাকাশে হয়েছে, আরও রোগা, আরও ন্যাতানো। মা, ঠাকুমা বার বার তার দিকে তাকিয়ে সারা দিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। ছেলে বাঁচলে হয়! তাই সবুজ লেজের কথা শুনে সবাই আঁতকে উঠল। টেবিল ঝাড়পোঁছ করা তো হলই, সারা বাড়িতে ছড়ানো হল কড়া কীটনাশক। এক তান্ত্রিক এসে প্রায় বিশ গ্রাম ওজনের আর—একটা তাবিজ বেঁধে দিয়ে গেল গলায়। মল্লিনাথ আরও একটু কুঁজো হয়ে গেল তার ভারে। তা বলে সবুজ লেজটা কিন্তু তাকে ছাড়ল না। তাবিজ নেওয়ার পরদিন সকালে পড়ার টেবিলে বসে সে 'গুপ্তধনের খোঁজে' নামে একটা গল্পের বই পড়ছিল। কনুইতে সুড়সুড়ি লাগায় সে তাকিয়ে দেখল সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা ড্রয়ার থেকে সেই কচি কলাপাতা রঙের সুন্দর সবুজ সরু লেজটা বেরিয়ে এসে খুব আদুরে—আদুরে ভাব দেখিয়ে নড়াচড়া করছে। মল্লিনাথ যে ভয় পেল তা নয়। সে চিরকাল কলকাতায় মানুষ। এই প্রায় দশ বছর পর্যন্ত সে একমাত্র চিড়িয়াখানায় ছাড়া আর কোথাও তেমন কোনো জীবজন্তু দেখেনি। লেজটা দেখে তাই তার ভারি অবাক লাগে। ভারি সুন্দর দেখতে, হাত দিতে ইচ্ছে করে। একটু ভয়ে—ভয়ে, সংকোচের সঙ্গে মল্লিনাথ হাত বাড়িয়ে লেজটা একটু ছুঁয়ে দিল। সুট করে সরে গেল লেজটা। পরদিন আবার বেরিয়ে এসে সুড়সুড়ি দিল হাতে। মল্লিনাথ আবার একটু ছুঁল। আর এইভাবেই রোজ সেই সবুজ লেজটার সঙ্গে তার দেখা হতে থাকে। একটু—একটু করে ভাব হতে থাকে। মল্লিনাথের ভারি ভালো লাগে লেজটাকে। একদিন ড্রয়ারটা একটু বেশি ফাঁক করে রাখল সে। লেজটা বেরিয়ে আসতেই উঁকি মেরে দেখল ভিতরে একটা বেশ লম্বা গড়নের সাপের মতো দেখতে প্রাণী কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমোচ্ছে। পরদিন ড্রয়ারটা আরও ফাঁক করল মল্লিনাথ, সকালবেলা যথারীতি আবার লেজটার সঙ্গে ভাব করতে করতে প্রাণীটিকে দেখল আড়চোখে। ছোটোখাটো একটা আমুদে সাপই হবে। অলসভাবে শুয়ে শুয়ে একটা আরশোলা চিবোচ্ছে।

পরদিন মল্লিনাথের ধৈর্য থাকল না। লেজটা বেরোতেই ড্রয়ারটা এক ঝটকায় খুলে ফেলল। লেজটা ধরল মুঠো করে। করুণ স্বরে বলল, 'আমার যে আর কোনো বন্ধু নেই।'

সাপটা মল্লিনাথের এই আচরণে ভারি বিরক্ত হয়ে কিলবিলিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল। সড়াত করে ড্রয়ার থেকে নেমে প্রাণপণে ছুটল ভেতর বাড়ির দিকে। মল্লিনাথও লাফিয়ে ওঠে। তার একমাত্র বন্ধু, ভাবের পাত্র পালিয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে মল্লিনাথও তার পিছনে ছোটে।

সবুজ সাপটা ভারি চালাক। সোজা পথে না গিয়ে সে খানিকক্ষণ এ—ঘর সে—ঘর করে পালিয়ে বেড়ায়। আলমারির তলা, খাটের তলা, জুতোর র্যাকের পিছন, চৌকাঠের আড়ালে ঘুরে অবশেষে উঠোন পেরিয়ে গিয়ে ভাঁড়ার—ঘরের পিছনে একটা ঘুপসি ঘুঁটে—কয়লা রাখার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের কোণে একটা মস্ত গর্তে সেঁধিয়ে গেল সুট করে।

মল্লিনাথ তা বলে হাল ছাড়ল না। গর্তের কাছে গিয়ে প্রথমে অনেক কাকুতি— মিনতি করল। কাজ হল না দেখে একটা লোহার শাবল এনে গর্ত বড়ো করতে বসল। মল্লিনাথের গায়ে জোর নেই, মাদুলির ভারেই

সে জর্জরিত। কিন্তু বন্ধু হারিয়ে যাওয়ার শোকে তার গায়ে দ্বিগুণ বল এল। তাবিজ কবচ মাদুলির জন্য শাবল চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে এক—এক টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিল সেগুলো। ভারি শাবলটা প্রাণপণে চালাতে লাগল।

হাত দেড়েক গর্ত খোঁড়ার পরই সে একটা ভুসভুসে ইঁটের গাঁথনি পেল। শাবলের দুটো চাড়ে উপড়ে ফেলল ইঁট। দেখল ঘরের নীচে আর—একটা গুপ্ত কুঠুরি রয়েছে। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। গর্তে মুখ দিয়ে মল্লিনাথ ডাকে, 'এসো ভাই সবুজ লেজ, আমার যে তুমি ছাড়া বন্ধু নেই। আমি যে ইস্কুলে যাই না, কারও সঙ্গে ভাব করতে পারি না, সবাই যে আমাকে খ্যাপায়।'

কিন্তু সবুজ লেজ আর বেরোয় না। মল্লিনাথ একটা টর্চ নিয়ে এসে গর্তের মধ্যে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

চোর—কুঠুরিতে টর্চের আলো ফেলে সে দেখল, চারদিকে তিন—চারটে লোহা আর কাঠের সিন্দুক। অনেক রুপোর আর সোনার বাসন রয়েছে দেয়াল আলমারিতে। কিন্তু সেসব গ্রাহ্যও করল না মল্লিনাথ। আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগল তার বন্ধুকে। সিন্দুক শাবলের চাড়ে খুলে ফেলে দেখল, রাশি রাশি সোনা আর রুপোর মোহর আর টাকা, হিরে জহরত, গয়না, সোনার বাঁট। সব হাঁটকে—মাটকে সে সবুজ লেজকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও পায় না। পায় না তো পায় না।

ক্লান্ত হয়ে সে একসময় শাবল আর টর্চ ফেলে দিয়ে হাঁটুতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। তারপর খুব রেগে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমিও মজা দেখাচ্ছি। আজ থেকেই আমি অন্য সব ছেলের সঙ্গে মিশব। তাদের সঙ্গে ভাব করব, খেলব। তখন দেখো তোমার হিংসে হয় কি না।'

এই বলে মল্লিনাথ কুঠুরির বাইরে বেরিয়ে আসে। গর্তের মুখ ভালো করে ইঁট আর মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেয়। তার চোখে জল, মুখ থমথম করছে অভিমানে।

দুম দুম করে পা ফেলে হেঁটে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। পাড়ার ছেলেরা গলির মুখ আটকে ইঁট সাজিয়ে রবারের বলে ক্রিকেট খেলছিল। মল্লিনাথ গিয়ে বল কেড়ে নিল একটা ছেলের হাত থেকে। তারপর দৌড়ে গিয়ে এমন জোরে বল করল যে, ইঁটের স্ট্যাম্প পর্যন্ত তিন হাত ছিটকে গিয়ে ভেঙে পড়ল। ছেলেরা মল্লিনাথের এলেম দেখে খ্যাপাতে ভুলে গেল। 'ওস্তাদ ওস্তাদ' বলে চেঁচাল কয়েকটা ছেলে। মল্লিনাথ পরের বলটা করল আরও ভয়ংকর। বলটাই ফেটে গেল ফটাস করে। যার বল, সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

মল্লিনাথ কাঁদুনে ছেলেটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। আমার বল ব্যাট অনেক আছে। আনছি।' বলে দৌড়ে গিয়ে মল্লিনাথ ব্যাট বল আনে। খেলা আবার জমে ওঠে।

মল্লিনাথ ব্যাটও করল অসাধারণ। রাগে গা রি—রি করছে। তাই এত জোরে ব্যাট চালাল যে, মার খেয়ে তিনতলা চারতলা পাঁচতলা বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে বল গিয়ে ওভার বাউন্ডারি হতে লাগল। তার খেলা দেখে সবাই থ।

অনেকক্ষণ খেলে ঘেমে চুমে মল্লিনাথ যখন বাসায় ফিরল, তখন তার রাগ অনেকটা কমেছে, মুখে হাসি ফুটেছে, চোখে মড়ার দৃষ্টি খুব জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। সেই দৃশ্য দেখে তার মা আর ঠাকুমা ভয় খেয়ে কেঁদে খুন। 'ওগো, কে আমাদের বাছাকে ওষুধ করেছে?'

শুনে মিটিমিটি হাসল মল্লিনাথ। ছাদে গিয়ে সে অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াল, বন্দুক টিপ করে তিনটে কাঁকড়াবিছে ঘায়েল করল, বনবন করে লাট্টু ঘোরাল। বিকেলে পাড়ার কাছে মাঠে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে তিন—তিনটে গোলও দিয়ে দিল মল্লিনাথ। সন্ধেবেলা বদ্যিনাথ বাড়ি ফিরলে সে গিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'বাবা, আমাকে ইস্কুলে ভরতি করে দাও। আমার অনেক বন্ধু চাই।'

শুনে বদ্যিনাথের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মল্লি ইস্কুলে আসতেই হাঁফ ধরে যাবে ছেলের!

ওদিকে মল্লিনাথের কাণ্ড দেখে মা আর ঠাকুমা শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে চেঁচাচ্ছেন আর কাঁদছেন। তাঁদের ধারণা মল্লি পাগল হয়ে গেছে, এবার হয়তো কামড়ে দেবে। বাড়ির চাকর তান্ত্রিককে ডাকতে গেছে।

বদ্যিনাথও মূর্ছাই যাচ্ছিল। মল্লিনাথই তাকে জল—টল দিয়ে চাঙ্গা করল। বলল, 'সবুজ লেজটা আমার সঙ্গে খুব বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওকে আমি মজা দেখাব।'

বদ্যিনাথ হ্যাঁ করে চেয়ে থাকে। কিছু বুঝতে পারে না।

তখন মল্লিনাথ ঘটনাটা খুলে বলে তার বাবাকে নিয়ে গিয়ে গর্ত দেখায়। মাটি ফের খুঁড়ে দু—জনে মিলে চোর—কুঠুরিতেও নামে। সব দেখিয়ে মল্লিনাথ বদ্যিনাথকে বলে, 'দেখলে তো সবুজ বন্ধুর জন্য খামোখা কত খেটেছি।'

বদ্যিনাথ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'তা বটে।'

মল্লিনাথ একমুঠো হিরে তুলে নিয়ে রাগের চোটে মেঝেয় ছুড়ে মেরে বলে, 'ওকে মজা দেখাব। অনেক বন্ধু হবে আমার, তখন বুঝবে।'

'ঠিক, ঠিক।' বদ্যিনাথ হাসিমুখে বলে।

তারপর বাপ—ব্যাটায় উঠে এসে গর্ত বুজিয়ে ফেলে। পরদিন রাজমিস্ত্রি এনে জায়গাটায় পাকা গাঁথনি দিয়ে দেয়।

এরপর থেকে মল্লিনাথ ক্রমে ক্রমে ভারি জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে। যেমন লেখাপড়ায় তেমনি খেলাধুলায়।

চোর—কুঠুরির কথা বাপ—ব্যাটা আর মুখেও আনে না।

হনুমান ও নিবারণ

নিবারণবাবু শান্তিপ্রিয় মানুষ। কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। উটকো উৎপাত তিনি পছন্দ করেন না। তবু তাঁর কপালেই হালে এক ঝামেলা এসে জুটেছে। বাড়ির সামনেই একখানা পেল্লায় জাম গাছ। সেই গাছে দু—তিন দিন আগে হঠাৎ কোথা থেকে এক বিশাল জাম্বুবান কেঁদো হনুমান এসে থানা গেড়েছে। এ তল্লাটে হনুমান বাঁদর ইত্যাদি কোনো কালেই ছিল না। হনুমানটা যে কোথা থেকে উটকো এসে জুটল তা কে জানে!

তা হনুমান আছে থাক, নিবারণবাবুর তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। হনুমান হনুমানের মতো থাক, তিনি থাকবেন তাঁর মতো। কিন্তু এই ব্যাটাছেলে হনুমান কী করে যেন টের পেয়েছে যে, এ পাড়ায় সবচেয়ে নিরীহ ভালো মানুষ হল এই নিবারণ ঘোষাল। হতচ্ছাড়া আর কাউকে কিছু বলে না, কারও দিকে দৃকপাত অবধি নেই। কিন্তু নিবারণবাবু বাড়ি থেকে বেরোলেই জামগাছে তুমুল আলোড়ন তুলে হুপহাপ দুপদাপ করে দাপাদাপি করতে থাকে।

প্রথম দিনের ঘটনা। শান্ত শরৎ কালের মনোরম সকাল। সোনার থালার মতো সূর্য উঠেছে। চারদিকে একেবারে আহ্লাদী রোদ। একটানা কোকিলও কুহুস্বরে ডাকছিল। নিবারণবাবু থলি হাতে প্রশান্ত মনে বাজার করতে বেরিয়েছেন। দুর্গানাম স্মরণ করে চৌকাঠের বাইরে সবে পা রেখেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জামগাছটায় ওই তুমুল কাণ্ড। নিবারণবাবু সভয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি ভারি ভীতু লোক।

গিন্নি বললেন, কী হল, ফিরে এলে কেন?

নিবারণবাবু আমতা আমতা করে বললেন, জামগাছে কী যেন একটা কাণ্ড হচ্ছে।

গিন্নি হেসে বললেন, ও তো একটা হনুমান। কাল আমিও দেখেছি। পাড়ার ছোঁড়ারা ঢিল মারছিল।

নিবারণবাবু একটা নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে বললেন, তাই বলো। হনুমান। জামগাছতলা দিয়েই রাস্তা আর রাস্তা দিয়ে মেলা লোক যাতায়াত করছে। দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা, বাজারমুখো এবং বাজারফেরত মানুষ, ঝাড়ুদার। হনুমান কাউকে দেখেই উত্তেজিত নয়, কিন্তু যেই নিবারণবাবু ফের দরজার বাইরে পা দিয়েছেন অমনি লম্ফঝম্প শুরু হয়ে গেল।

নিবারণবাবু তখন সাহসে ভর করে একটু দৌড় পায়েই জামগাছটা পেরিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তি রয়ে গেল মনের মধ্যে।

তবে সেদিন বাজারে গিয়ে মনটা ভারি ভালো হয়ে গেল। সস্তায় বেশ বড়ো বড়ো পাবদা মাছ পেয়ে গেলেন। মরশুমের প্রথম ফুলকপি একটু দর করতেই দাম নেমে গেল, আর এক আঁটি ধনেপাতা কিনে ফেললেন মাত্র চার আনায়। বাজার সেরে যখন ফিরছেন তখন আর হনুমানটার কথা তাঁর খেয়াল নেই। যেই আনমনে জামগাছটার কাছাকাছি এসেছেন অমনি ডালপালায় তুমুল শব্দ করে হনুমানটা নেমে এল একেবারে নীচে। একখানা ডাল ধরে এমন ঝুল খেতে লাগল যে তার লেজখানা নিবারণবাবুর নাকের ডগা ছোঁয়—ছোঁয়। নিবারণবাবু জীবনে দৌড়ঝাঁপ বিশেষ করেননি, তবু হনুমানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য সেদিন এমন দৌড় দিলেন যে তাঁর ছোটোছেলে বিশু অবধি পরে প্রশংসা করে বলেছিল, বাবা, তুমি যদি সিরিয়াসলি দৌড়োতে তাহলে অলিম্পিক থেকে প্রাইজ আনতে পারতে। চটি পরা পা আর বাজারের ব্যাগ নিয়ে যে—কেউ অমন দৌড়াতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না।

দৌড়টা যে ভালোই হয়েছিল তা নিবারণবাবুও জানেন, তবে শেষ অবধি চটিজোড়া পায়ে ছিল না, ছিটকে পড়েছিল। আর বাজারের ব্যাগ হাতছাড়া হয়ে সাধের পাবদা মাছ চারটেকে নিয়ে গেল, ছ—খানা ডিম ভাঙল আর রাস্তার একটা গোরু দু—খানা ফুলকপি চিবিয়ে খেয়ে নিল।

দ্বিতীয়বার ঘটনাটা ঘটল অফিসে বেরোনোর সময়। নিস্তব্ধ জামগাছতলা দিয়ে বিস্তর লোক বিষয়কর্মে যাচ্ছে আসছে। কিন্তু টিফিনকৌটো নিয়ে ছাতা বাগিয়ে গালে পানটি পুরে দুর্গানাম স্মরণ করে যেই নিবারণবাবু বেরোলেন অমনি জামগাছে যেন ঝড় উঠল। হনুমানটা এ ডালে ও ডালে ভীষণ লাফালাফি করতে করতে হুপহাপ করে বকাঝকাই করতে লাগল বোধহয়!

কিন্তু অফিস তো আর কামাই করা যায় না, নিবারণবাবু ছাতাখানা ফট করে খুলে তার নীচে আত্মগোপন করে প্রাণপণে দৌড় লাগালেন। কিন্তু স্পষ্ট টের পেলেন, জামগাছটা পেরোনোর সময় হনুমানটা তাঁর ছাতায় একটা খাবলা মারল।

গত তিনদিন ধরে নিবারণবাবুর জীবনে আর শান্তি নেই। আসতে হনুমান, যেতে হনুমান। হনুমানটা কেন যে শুধু তাঁর পিছনে লাগছে তা চিন্তা করে করে তিনি হয়রান। খেতে পারছেন না, ঘুমোতে পারছেন না, তিনদিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর দুই ছেলে কানু আর বিশু হনুমানটাকে তাড়ানোর জন্য বিস্তর ঢিল আর গুলতি ছুড়েছে, তাদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেরাও। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। হনুমানটা গাছের মগডালে উঠে ঘন ডালপালার মধ্যে চুপচাপ বসে আছে। ইঁট—পাটকেল তার ধারে—কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

গিন্নি বললেন, পূর্বজন্মে ও তোমার ভাই ছিল, তাই এত টান।

নিবারণবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, হনুমানের ভাই হতে আমি যাব কেন?

দুশ্চিন্তা নিয়েই নিবারণবাবু রাতে শুয়েছেন। তবে ঘুম আসছে না। মাথাটা বেশ গরম। কাল সকালেই আবার বাজার আছে, অফিস আছে। জামগাছতলা ছাড়া যাওয়ার পথ নেই। শুয়ে এপাশ—ওপাশ করছেন। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে পুরী বা ওয়াল্টেয়ার ঘুরে আসবেন কিনা তাও ভাবছেন।

হঠাৎ একটা বিকট হুপ শব্দে নিস্তব্ধ রাতটা যেন কেঁপে উঠল। নিবারণবাবু চমকে উঠে বসলেন আতঙ্কে। অন্ধকার ঘর, তবু জানলার দিকে চেয়ে তাঁর বুক হিম হয়ে গেল। জানলাটা অর্ধেক ভেজানো ছিল। এখন জানলাটা পুরো খোলা। আর গ্রিল ধরে সেই অতিকায় হনুমানটা দাঁড়িয়ে। দু—খানা চোখ ভাটার মতো জ্বলছে।

ভয়ে এমন সিঁটিয়ে গেলেন নিবারণবাবু যে, কাউকে ডাকতে পারলেন না, গলা দিয়ে স্বরই বেরোলো না তাঁর। কিছুক্ষণের জন্য যেন পাথর হয়ে গেলেন।

হঠাৎ একটা বেশ ভরাট গমগমে গলা বলে উঠল, ভয় পাবেন না...ভয়ের কিছু নেই...

বিস্ময়ে হতবাক নিবারণবাবু কে কথা বলল, তা চারদিকে চেয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে কারও থাকার কথা নয়।

কণ্ঠস্বরটি ফের বলে উঠল, রামচন্দ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাঁর দূত মাত্র।

নিবারণবাবু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। স্বপ্ন দেখছেন কিনা তা বুঝবার জন্য হাতে একখানা রাম চিমটি কেটে নিজেই উঃ করে উঠলেন।

গলাটা বলল, স্বপ্ন নয়। যা দেখছেন, যা শুনছেন সব সত্যি।

নিবারণবাবু হনুমানের দিকে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, কথাগুলো কী আপনিই বলছেন? মানুষের ভাষায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের হাতে সময় বিশেষ নেই। রামচন্দ্র অপেক্ষা করতে ভালোবাসেন না।

রামচন্দ্র কে?

আমার প্রভু।

কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে?

আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।

ও বাবা! আমি পারব না, আমার বড়ো ভয় করছে।

ভয় কীসের?

আমার ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে ঠেকছে।

গোলমালের কিছু নেই। চলে আসুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নিবারণবাবু বুঝলেন, এসব ভূতুড়ে কাণ্ড। এবং বেশ জবরদস্ত ভূতের পাল্লায় তিনি পড়েছেন। তবে এখনও উদ্ধারের উপায় আছে। তিনি ঘুমন্ত গিন্নিকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে জাগাতে জাগাতে কানু আর বিশুকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। সে এমন রামধাক্কা আর বিকট চেঁচানি যে মরা মানুষেরও উঠে বসবার কথা। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দই পেলেন না।

হনুমান বলল, ওদের ঘুম এখন ভাঙবে না। বৃথা চেঁচামেচি করছেন।

ভয়ে নিবারণবাবুর শরীর প্রথমে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তার ভয়ে আবার কলকল করে ঘাম হতে লাগল। বুকের ভিতরটা এমন ধড়ফড় করছে যে, হার্টফেল হওয়ার জোগাড়।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, এসব আমার ভালো লাগছে না।

নিবারণ শুয়ে পড়ে জোর করে চোখ বন্ধ করে রইলেন।

হনুমান বলল, নিবারণবাবু, প্রভুর হুকুম তামিল না করে আমার উপায় নেই। আপনি সহজে না গেলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।

এই বলে হনুমান চুপ মারল। নিবারণবাবু চোখ মিটমিট করে দেখতে পেলেন, হনুমান দু—হাতে গ্রিল ধরে টানাটানি করছে। শক্ত লোহার গ্রিল, ভাঙতে পারবে বলে মনে হল না নিবারণবাবুর।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হনুমান মাত্র একটা হ্যাঁচকা টানেই পুরো গ্রিলটা জানলার ফ্রেম থেকে উপড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলল।

নিবারণবাবু এত ভয় পেয়েছেন যে, আরও বেশি ভয় পাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। মজা হল ভয় যখন সাংঘাতিক বেশি হয় তখন মানুষের একটা মরিয়া সাহসও আসে। চোর তাড়ানোর জন্য খাটের মাথার কাছে একখানা মোটা বেতের লাঠি রাখা থাকে। আজ অবধি সেটা কোনো কাজে লাগেনি। আজ লাগল। নিবারণবাবু ভাবলেন, এমনিতেও গেছি, অমনিতেও গেছি, সুতরাং আর ভয়ের কী? যা থাকে কপালে—

ভেবে লাফিয়ে উঠে তিনি লাঠিটা নিয়ে প্রবল বিক্রমে হনুমানের মাথায় বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বসালেও লাঠিটা ঠিকমতো বসল না।

হনুমান খুব আলগা হাতে লাঠিটা কেড়ে নিল হাত থেকে, তারপর সেটাকে প্যাঁকাটির মতো ভেঙে ফেলে বলল, কেন ঝামেলা করছেন? প্রভু রামচন্দ্র ডাকছেন, এ আপনার মহা সৌভাগ্য।

নিবারণবাবু যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হনুমানটা লম্বায় প্রায় তাঁর সমান। আর চওড়ায় কুস্তিগীরদের মতো। এতবড়ো হনুমান তিনি এর আগে আর দেখেননি। বিপদে পড়ে মাথাটা একটু গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি হনুমানের কথাগুলো শুনেও বুঝবার চেষ্টা করেননি। এবার তাঁর হঠাৎ মনে হল, এ কী সেই রামচন্দ্রের হনুমান নাকি? হনুমান তো অমর, তার এখনও পৃথিবীতে বেঁচে—বর্তে থাকবার কথা। আর প্রভু রামচন্দ্র তিনি তো স্বয়ং ভগবান। তাহলে এসব হচ্ছেটা কী? রামচন্দ্র তাঁর ভক্ত হনুমানকে পাঠিয়েছেন তাঁকে ডাকবার জন্য। কিন্তু কেন? তিনি তো তেমন উঁচুদরের ভক্ত বা ধার্মিক নন!

হনুমান জলদগম্ভীর গলায় বলল, আমার লেজটা ধরুন।

ভয়ে ভয়ে নিবারণবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে লেজটা ধরলেন আর ধরতেই যেন চৌম্বক আকর্ষণে হাতদুটো লেজের সঙ্গে আটকে গেল। আর দাঁড়ানোর উপায় রইল না।

তারপর যে কী হল তা নিবারণবাবু ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন না। হনুমান তাঁকে জানালা গলিয়ে বাইরে এনে ফেলল এবং তারপর ইঞ্জিনের মতো ছুটতে শুরু করল। এত ছুট জীবনে কখনো ছোটেননি নিবারণবাবু। তবে কেন যেন তাঁর হাঁফ ধরছিল না। চোখের পলকে নিজেদের তল্লাট এবং শহর ছাড়িয়ে খোলা মাঠঘাটে এসে গেলেন তাঁরা। হনুমান মস্ত মস্ত লাফ মেরে ঢেউয়ের মতো চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিবারণবাবুও ঢেউ হয়ে বয়ে যাচ্ছেন। প্রায় দশ—বারো হাত দূরে দূরে এক—একবার পা মাটিতে ঠেকছে।

অনেকটা চলে আসার পর একটা জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তাঁরা। তারপর একটা ফাঁকা চত্বর। জঙ্গলঘেরা জায়গাটায় একটা লোক পিছনে হাত রেখে মৃদুমন্দ পায়চারি করছে। লোকটা বেঁটে এবং দেখতে একটু কিম্ভূত। পরনে একটা পাশবালিশের ওয়াড়ের মতো পোশাক, মাথায় একটা সরু টুপি। লোকটার গোল মুখখানায় চোখ নাক কান কোনোটাই ঠিক জায়গায় নেই বলে মনে হল দূর থেকে।

কাছে গিয়ে হনুমান লোকটাকে প্রণাম করে বলল, প্রভু এনেছি।

লোকটা নিবারণের দিকে ফিরে তাকাল, মুখটা ভালো করে দেখে আঁতকে উঠলেন নিবারণবাবু। এর চোখদুটো দুই গালে। ঠোঁটদুটো নাকের ওপরে। আর গলা বলে কিছু নেই। কানদুটো গোরুর কানের মতো।

এই কি রামচন্দ্র? এত বিচ্ছিরি দেখতে?

রামচন্দ্র লোকটা ডান গালের চোখটা দিয়ে নিবারণবাবুকে দেখে নিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, পেন্নাম করলে না?

যে আজ্ঞে। বলে নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র খকখক শব্দ করে হেসে বললেন, শোনো হে বাপু, আমি সত্যিই কিন্তু তোমাদের সেই রামায়ণের রামচন্দ্র নই। তার গল্পটা বেশ লাগে, তাই ভাবলুম রামচন্দ্র নামটা নিলে মন্দ হয় না।

আপনি আসলে কে তাহলে?

লোকটা মাথাটা একটু নেড়ে বলে, সে বাপু অনেক কথা। তবে সোজা কথায় আমি এ তল্লাটের লোক নই, এই দেশের নই, এমনকী এই হতচ্ছাড়া নোংরা গ্রহেরও নই। অনেক দূরের পাল্লা রে বাপু। আর আমার এই হনুমানটিও আসল হনুমান নয়। কলের হনুমান। তবে কল হলেও বড়ো খুঁতখুঁতে, সবাইকে পছন্দ করে না। দুনিয়া ঘুরে ঘুরে মাত্র একটা লোককেই ও বেছে বের করেছে। সে হল তুমি।

নিবারণবাবু ঘন ঘন চোখ কচলাচ্ছিলেন। প্রত্যয় হচ্ছে না। যা শুনছেন সব সত্যি নাকি? এসব তো কল্পবিজ্ঞানে থাকে।

রামচন্দ্র বলল, তোমাদের গ্রহটা নোংরা হলেও মহাকাশে আমার কাজের পক্ষে সুবিধেজনক।

আমার হনুমানকে তাই তোমাদের গ্রহে পাকাপাকিভাবে রেখে যেতে চাই। সমস্যা হল, ওকে ঠিকমতো দেখাশুনা করার লোক চাই। ও তোমাকে খুঁজে বের করেছে, কাজেই ওর ভার তোমাকেই নিতে হবে।

নিবারণবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, যে আজ্ঞে, তবে কেমন যত্নআত্তি করতে হবে?

খুব সোজা, ওর মাথায় একটা ছোট্ট ফুটো আছে, চাঁদির একেবারে মাঝখানে। এই তেলের কৌটোটা নাও, মাসে একবার ওই ফুটোর মধ্যে দু—ফোঁটা তেল ঢেলে দিলেই হবে। আর তোমার বাড়ির জামগাছটাতেই ও থাকবে। ওকে যেন কেউ বিরক্ত না করে দেখো। বেশি বিরক্ত করলে কিন্তু ও গা থেকে এমন রশ্মি বের করতে পারে যা তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

নিবারণবাবু শিউরে উঠে বললেন, যে আজ্ঞে।

আর তুমি ইচ্ছে করলে ওকে ফাইফরমাস করতে পারো, ওর সঙ্গে হিল্লি—দিল্লি বেড়িয়ে আসতে পারো।

নিবারণবাবু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, যে আজ্ঞে।

তাহলে এসো গিয়ে। কোনোরকম গোলমাল কোরো না কিন্তু।

আজ্ঞে না।

লোকটা অর্থাৎ রামচন্দ্র গটগট করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা শিস দিল। অমনি মাটির তলা থেকে একটা কিম্ভূত পটলাকৃতি মহাকাশযান বেরিয়ে এল। লোকটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই জিনিসটা সাঁ করে আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।

নিবারণবাবু এখন বেশ আছেন। হনুমানটা জামগাছেই থাকে। তবে তাকে আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং মাঝরাতে হনুমানটা এসে তাঁর সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দিয়ে যায়। ঘরের কাজকর্মও অনেক করে দেয়। গিন্নি তো পছন্দ করেনই, বিশু আর কানুরও সে বেশ বন্ধু হয়ে গেছে।

হনুমানকে তেল দিতে নিবারণবাবুর একবারও ভুল হয় না।

ঘুড়ি ও দৈববাণী

অঘোরবাবু নিরীহ মানুষ। বড়োই রোগা—ভোগা। তাঁর হার্ট খারাপ, মাজায় সায়াটিকার ব্যথা, পেটে এগারো রকমের অসুখ। অফিসে তাঁর উন্নতি হয় না। কেউ পাত্তা দেয় না তাঁকে।

অঘোরবাবু ঘুড়ি ওড়াতে খুবই ভালোবাসেন। তাঁর শখ—শৌখিনতা বলতে ওই একটাই। ঘুড়ি তিনি নিজেই তৈরি করেন। মস্ত মস্ত ঘুড়ি। মোটা সুতো আর মস্ত লাটাই দিয়ে অনেক ওপরে ঘুড়ি ভাসিয়ে দেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাটাই ধরে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসে থাকেন।

সেদিন একটা কাণ্ড হল। বিকেল বেলা ঘণ্টা দুয়েক ঘুড়ি ওড়ানোর পর অন্ধকার হয়ে আসায় লাটাই গুটিয়ে যখন ঘুড়িটা ছাদ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন তখন মনে হল ঘুড়ির গায়ে একটা কিছু যেন লেখা আছে। ঘরে এসে আলো জ্বেলে দেখলেন, সাদা ঘুড়িতে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা, আগামী সতেরো তারিখে আপনার মৃত্যু হবে, যদি না একখানা আস্ত গায়ে—মাখা সাবান খেয়ে ফেলেন।

অঘোরবাবু ঘোরতর অবাক। প্রায় আধ কিলোমিটার উপরে উড়ন্ত ঘুড়ির গায়ে এই বিদকুটে কথাটা লিখল কে? ভৌতিক কাণ্ড নাকি? মহা ভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি। পাশের বাড়িতেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পরঞ্জয় প্রামাণিক থাকেন। অঘোরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে ডেকে ঘুড়ির গায়ে কথাটা দেখিয়ে বললেন, এটা কী করে সম্ভব হল?

পরঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে সাবানটা খেয়ো না, সাবান খেলে পেট খারাপ হয়। মনে হচ্ছে কেউ রসিকতা করেছে।

অঘোরবাবু বললেন, কিন্তু আকাশের অত ওপরে কোনো রসিকের তো থাকার কথা নয়। রসিকদের কী আজকাল ডানা গজাচ্ছে?

পরঞ্জয় এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

অঘোরবাবু হিসেব করে দেখলেন সতেরো তারিখের আর মোটে সাতদিন বাকি। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে তিনি বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাথরুমে গিয়ে একখানা গায়ে—মাখা সাবান অত্যন্ত কষ্ট করে খেয়ে ফেললেন। সাবান যে খেতে এত বিচ্ছিরি তা তাঁর জানা ছিল না।

পরঞ্জয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। পরদিন অঘোরবাবু পেটের গোলমালে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। দু—দিন লাগল বিছানা ছেড়ে উঠতে। বিকেলে তিনি আবার ঘুড়ি ওড়াতে ছাদে উঠলেন। এবং যথারীতি লাটাই গোটানোর পর দেখলেন ঘুড়ির গায়ে লেখা রয়েছে, আগামী সতেরো তারিখে আপনি মারা যাবেন, যদি না কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলে দেন।

কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, সে হল এ পাড়ার কুখ্যাত গুন্ডা। তার ভয়ে সবাই থরহরি কম্পমান। গায়ে যেমন জোর তেমনি বদমেজাজ। অঘোরবাবু ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু এই অনৈসর্গিক আদেশ অমান্য করতেও তাঁর সাহস হচ্ছে না। সতেরো তারিখের আর দেরিও নেই। আজ চোদ্দো তারিখ।

সন্ধের পর তিনি সোজা গিয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হলেন। কৃষ্ণ কুণ্ডু তখন একটা মস্ত বড়ো ছোরা ধার দিচ্ছিল। তাঁকে দেখে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, কী চাই?

অঘোরবাবু কাঁপতে কাঁপতে সামনে গিয়ে আচমকা ডান হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডুর বাঁ কানটা মলে দিয়েই দৌড় লাগালেন।

কিন্তু দৌড়ে পারবেন কেন? কৃষ্ণ কুণ্ডু ছুটে এসে ক্যাঁক করে তাঁর ঘাড়টা ধরে নেংটি ইঁদুরের মতো শূন্যে তুলে উঠোনে এনে ফেলল। তারপর মুগুরের মতো দু—খানা হাতে গদাম গদাম করে ঘুষি মারতে লাগল।

তিনি ঘুষি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ায় পিঠের ওপর একেবারে তবলা লহরার মতো কিল—চড়—ঘুষি পড়তে লাগল। জীবনে এরকম সাংঘাতিক মার কখনো খাননি অঘোরবাবু। যখন ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মনে হচ্ছিল, শরীরের একটি হাড়ও আস্ত নেই। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন। কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।

ফের দু—দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হল। তারপর অঘোরবাবু ফের একদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়ালেন। আজও ঘুড়ি নামিয়ে দেখলেন তাতে লেখা, সতেরো তারিখে মৃত্যু অবধারিত, যদি না বড়ো সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালতে পারেন। বড়ো সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার আদেশের চেয়ে মৃত্যুদণ্ডই বোধহয় ভালো। কারণ, অঘোরবাবুর অফিসের বড়ো সাহেব খোদ আমেরিকার রাঙামুখো সাহেব। যেমন রাশভারি, তেমনি শৃঙ্খলাপরায়ণ। পান থেকে চুন খসতে দেন না। তা ছাড়া বড়ো সাহেবের নাগাল পাওয়া কঠিন। আলাদা ঘরে বসেন, বাইরে আর্দালিরা পাহারা থাকে।

কিন্তু ঘুড়ির আদেশ অমান্য করতে সাহস হল না তাঁর। দোকান থেকে দই আনিয়ে গেলাসভরতি ঘোল তৈরি করে একটা ফ্লাস্কে ভরে অফিসে গেলেন অঘোরবাবু। খুবই অন্যমনস্ক, বুকটা দুরদুর করছে। বড়োবাবুকে গিয়ে একবার বললেন, বড়ো সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, ব্যবস্থা করে দেবেন?

বড়োবাবু অবাক হয়ে বললেন, তুমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিচ্ছ কেন? বড়ো সাহেব কী হেঁজিপেঁজির সঙ্গে দেখা করেন। আর করেই লাভ কী? সাহেবের আমেরিকান ইংরিজি কী তুমি বুঝবে? বকুনি শুনলে ভড়কে যাবে যে।

বেজার মুখে ফিরে এলেন বটে অঘোরবাবু, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। টিফিনের সময় ফাঁক বুঝে বেরিয়ে করিডোর ঘুরে সোজা বড়ো সাহেবের খাস কামরার সামনে হাজির হলেন। দেখলেন বড়ো সাহেবের ঘর থেকে কয়েকটা লালমুখো সাহেব বেরিয়ে আসছে। আর্দালি দুটো তাদের নিয়েই ব্যস্ত।

অঘোরবাবু সুট করে ঘরে ঢুকে পড়লেন। বিশাল চেহারার বড়ো সাহেব মন দিয়ে একটা কাজ করছিলেন। মাথায় মস্ত গোলাপি রঙের টাক। অঘোরবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট বাবু?

অঘোরবাবু ফ্লাস্কটা খুলে সাহেবের মাথায় হড়হড় করে ঘোলটা ঢেলে দিলেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায় নেমে একটা বাসে উঠে পড়লেন।

চাকরি তো যাবেই, পুলিশেও ধরতে পারে। তা হোক, তবু অনৈসর্গিক ওই আদেশ লঙ্ঘন করেনই বা কী করে?

সতেরো তারিখ এগিয়ে আসছে। আগামীকালই সতেরো তারিখ। বিকেলে অঘোরবাবু ফের ঘুড়ি ওড়ালেন। অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে নানা কথা ভাবছিলেন। বুকটাও দুরদুর করছে। তারপর ধীরে ধীরে লাটাই গোটাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঘুড়িটা নেমে এল। ঘুড়িটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা, আগামী সতেরো তারিখে মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না, যদি না এক্ষুনি তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন।

অঘোরবাবুর হাত—পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। তিনতলা থেকে লাফ দিলে যে মৃত্যুর জন্য আর সতেরো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু করেনই বা কী? ঘুড়ি মারফত দৈববাণীই হচ্ছে বলে তাঁর স্থির প্রত্যয় হয়েছে দৈববাণীর আদেশ না মানলে যদি ভগবান চটে যান?

অঘোরবাবু চোখ বুজে ভগবানকে স্মরণ করলেন। শেষবারের মতো চারদিকটা জল—ভরা চোখে একবার দেখে নিলেন। এইসব কাজে বেশি দেরি করতে নেই। দেরি করলেই মন দুর্বল হয়ে পড়ে, দ্বিধা আসে। অঘোরবাবু ধুতির কোঁচা এঁটে ছাদের রেলিঙের ওপর উঠে দুর্গা বলে নীচে লাফিয়ে পড়লেন।

পড়ে মাজার ব্যথায়, ঘাড়ের ঝনঝনিতে, কনুইয়ের খটাং—এ, মাথার কটাং—এ চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে মূর্ছা গেলেন। পাড়ার লোক, বাড়ির লোক সব দৌড়ে এল, কান্নাকাটি পড়ে গেল। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। প্রায় পনেরো দিন সেখানে পড়ে থাকতে হল। তারপর বাড়িতে এনে ফের কিছুদিন চিকিৎসা চলল তাঁর। পারিবারিক ডাক্তার অভয়বাবু তাঁর বন্ধুও বটে। অভয়বাবু কয়েকদিন ধরে নানারকম পরীক্ষা করার পর একদিন বললেন, বুঝলে অঘোর, একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। অঘোরবাবু ভয় খেয়ে বললেন, কী ঘটেছে ভাই?

তোমার হার্ট একদম ভালো হয়ে গেছে।

সে কী! কী করে হল?

ওই যে কেষ্ট গুন্ডার কাছে মার খেয়েছিলে, মনে হচ্ছে সেই শক থেরাপিতেই হার্টটা ঠিকঠাক চলতে শুরু করেছে। হার্টের একটা ভালভ কাজই করছিল না। এখন করছে। আরও একটা ব্যাপার!

আবার কী?

তোমার পেটে এগারো রকমের অসুখ ছিল। এখন একটাও নেই।

বলো কী হে!

হ্যাঁ। ওই যে সাবান খেয়েছিলে, ওর ঠেলাতেই পেটের সব রোগজীবাণু বেরিয়ে গেছে। এখন লোহা খেলেও তোমার হজম হবে। আরও একটা ব্যাপার।

অঘোরবাবু অবাকের পর আরও অবাক হয়ে বললেন, আরও?

হ্যাঁ। তোমার সায়াটিকা সেরে গেছে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ, ওই যে ছাদ থেকে লাফ দিয়েছিলে তারই চোটে সায়াটিকা উধাও হয়ে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার!

হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য ব্যাপার!

কিন্তু সব হলেও চাকরিটা তো আর থাকছে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অঘোরবাবুর খুব দুঃখ হয়। দিব্যি বাঁধা চাকরি ছিল। বড়ো সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার পর আর কোনো আশা নেই।

অঘোরবাবু যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসেছেন, একটু পায়চারি—টায়চারি করতে পারছেন তখন একদিন সকালবেলা তাঁর বাড়ির সামনে মস্ত একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে এক লালমুখো বিশাল সাহেব নেমে এলেন।

অঘোরবাবু বেজায় ঘাবড়ে গেলেন।

কিন্তু অল্পবয়সি সাহেবটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে এমন আনন্দ করতে লাগল যে সেই ভীম আলিঙ্গনে অঘোরবাবুর প্রাণ যায় আর কী।

তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সাহেব বলল, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব তা বুঝতে পারছি না। যাকগে, আপাতত তোমাকে তিনগুণ প্রমোশন দিয়ে আমার অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার করে নিচ্ছি। তোমার দু—হাজার টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অফিসে যাতায়াতের জন্য গাড়িও দেওয়া হবে।

অঘোরবাবু স্বপ্ন দেখছেন কিনা বুঝতে পারছিলেন না। নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখলেন, জেগেই আছেন। তাহলে এসব কী হচ্ছে?

সাহেব নিজে থেকেই বলল, তোমার মতো গুণী মানুষ দেখিনি। টাক নিয়ে আমার খুব দুঃখ ছিল। টাকের জন্য কত ওষুধ খেয়েছি, কত চিকিৎসা করেছি, কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু তুমি সেদিন আমার মাথায় কী একটা ওষুধ ঢেলে দিয়ে এলে, এই দেখ এখন আমার মাথাভরতি সোনালি চুল।

তাই বটে। ইনি তো বড়ো সাহেবই বটে। মাথাভরতি চুল হওয়ায় এতক্ষণ চিনতে পারেননি অঘোরবাবু। গদগদ হয়ে বললেন, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।

কুস্তির প্যাঁচ

যে লোকটা রোজ ভোররাতে উঠে দেড়শো বুকডন আর তিনশো বৈঠক দেয়, তারপর জিমনাস্টিকস করে, বালির বস্তায় ঘুষি মারে এবং কুংফু ক্যারেট জুডো অভ্যাস করে, তার আবার মর্নিংওয়াকের কী প্রয়োজন, এটা অনেকেরই প্রশ্ন। কিন্তু গোয়েন্দা বরদাচরণ এর জবাব দিতে পারবেন না। তবে এটা ঠিক যে, আজও প্রতিদিন সকালে তাঁকে দাদুর সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে যেতে হয়। যখন থেকে হাঁটতে শিখেছেন, সেই তখন থেকে আজ অবধি রোজ।

বরদাচরণের দাদুর বয়স পঁচাশি। যৌবনকালে নামকরা কুস্তিগীর ছিলেন। অনেক মেডেল কাপ শিল্ড পেয়েছেন। এখনও শালগাছের মতো ঋজু ও প্রকাণ্ড শরীর। রোজ কুড়ুল চালিয়ে দু—মন করে কাঠ কাটেন। পুকুরে ঘণ্টাখানেক সাঁতরান। কুয়ো থেকে বিশ—ত্রিশ বালতি জল তোলেন। যৌবনে গোটা একটা খাসির মাংস খেয়ে ফেলতে পারতেন! ডিম খেতেন দু—ডজন করে। আধ সের ঘি। পাঁচ সের দুধ। এখন আর অত খান না। তবু যা খান, তা তিনটে লোকের খোরাক। সকালে উঠে পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিয়ে ফুসফুস পরিষ্কার করতে প্রাতর্ভ্রমণ তাঁর নিত্যকর্ম। এখনও তাঁর চুল পাকেনি। দাঁত পড়েনি, চামড়া কোঁচকায়নি। পঁচাশি বছরেও দিব্যি সুঠাম চেহারা অম্বিকাচরণের। তবে কিনা লোকটা একটু বাতিকগ্রস্ত। তাঁর কাছে সবকিছুই সেই আগের মতোই আছে, কিছুই পালটায়নি।

এই যে বরদাচরণ এখন পূর্ণযুবক, ইয়া দশাসই লম্বা—চওড়া চেহারা, তার ওপর নামকরা গোয়েন্দা, এসব অম্বিকাচরণের খেয়ালেই থাকে না। সকালে উঠেই তিনি দাঁতন করে, পুজোপাঠ সেরে থানকুনিপাতা আর কলি—ওঠা ছোলা খেয়ে হাঁক দেন, 'দাদুভাই ও দাদুভাই।' ডাক শুনে মনে হয় যেন তিন—চার বছর বয়সি নাতিকে ডাকছেন। সেই ডাক শুনে বরদাচরণ গুটিগুটি দাদুর কাছে এসে দাঁড়ান। তারপর দাদুর হাত ধরে পিছু—পিছু বেরিয়ে আসেন। দাদু অম্বিকাচরণ যেভাবে বহুকাল আগে ছোটো বরদাচরণকে সাবধানে নর্দমা পার করাতেন, এখনও তেমনি হাত ধরে নর্দমা পার করে দেন। গাড়িঘোড়া দেখলে বলেন, 'সরে এসো দাদুভাই, চাপা দেবে যে!' কুকুর বা গোরু দেখলে হাঁ হাঁ করে ওঠেন, হাতের লাঠিটা আপসাতে—আপসাতে বলেন, 'যাঃ যাঃ, দাদুভাই ভয় পেয়ে কাঁদবে!'

বরদাচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কী আর করবেন! পরশুদিনও তিনি একজন ডাকাতকে ধরতে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমেছেন। গত মাসেই তিনি খুনি রঘুবীর সিংয়ের পিস্তলের মুখে পড়েছিলেন। এই তো সেদিন কুখ্যাত একদল হাইজ্যাকারের পিছু নিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের এক বোয়িং সাতশো সাঁইত্রিশ বিমানের একেবারে কেবিনের মধ্যে দুর্দান্ত ফাইট করে চারজন বিমান—ছিনতাইকারীকেই ঘায়েল করে এলেন। কিন্তু দাদুকে সে—কথা কে বোঝাবে?

দাদুর সঙ্গে বরদাচরণের এই মর্নিংওয়াক দেখে সবাই ভারি অবাক হয়।

হঠাৎই একদিন একখানা ঘটনা ঘটল। যাকে বলা যায় বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। প্রায় ষাট বছর আগে মুর্শিদাবাদের এক নবাবের বাড়িতে বিখ্যাত পাঞ্জাবি কুস্তিগীর শের সিংকে অম্বিকাচরণ হারিয়ে দেন। তাই নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। নবাব খুশি হয়ে সোনায় বাঁধানো একখানা কাপ উপহার দিয়েছিলেন অম্বিকাচরণকে। এখনকার বাজারে সেই কাপটার দাম হেসেখেলে বিশ—পঁচিশ হাজার টাকা তো হবেই। অম্বিকাচরণ একখানা কাচের বাক্সে যত্ন করে কাপটা রেখে দিয়েছিলেন। নিজ হাতে রোজ মোছেন, কেউ এলে দেখান। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, কাপটা নেই। তার বদলে কাচের বাক্সে একটা চিরকুট পড়ে আছে। তাতে লেখা: 'অম্বিকাভাই, লড়াইটায় জোচ্চুরি ছিল। তুমি আমাকে চিত করতে পারোনি। আমার কোমরটা মাটিতে লেগেছিল মাত্র। কিন্তু নবাবের ব্যান্ডপার্টি তখন এমন জগঝম্প বাজনা শুরু করে দিল আর তাই শুনে তুমি জিতেছ ভেবে সব মেয়ে—বউরা এমন শাঁখ বাজাতে আর উলু দিতে লাগল যে, আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। ওরকম আওয়াজ আমি জীবনে শুনিনি। তোমাকে কাঁধে নিয়ে লোকের সে কী নাচ! আমি নবাবকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে, লড়াইটা এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু কে কার কথা শোনে? নবাব আমাকে আমলই দিলেন না। সেই থেকে মনের মধ্যে আগুন পুষে রেখেছি। ইচ্ছে ছিল তোমাকে অনেক আগেই হারিয়ে দিয়ে প্রমাণ করি যে, তোমার চেয়ে আমি অনেক বড়ো কুস্তিগীর। কিন্তু সেই সুযোগ আর এতকালের মধ্যে ঘটে ওঠেনি। নানা ধান্ধায় আমাকে দেশ—বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তবে সর্বদাই আমি তোমার খোঁজখবর রেখেছি। এতদিন বাদে ফের তোমার পাত্তা মিলেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে তোমাকে পেলাম না। দেখলাম, সেই ট্রফিটা তোমার ঘরে আজও সাজানো আছে। দেখে পুরোনো স্মৃতিটা চাগিয়ে উঠল। রক্ত গরম হয়ে গেল, হাত—পা নিশপিশ করতে লাগল। সামনে তোমাকে পেলে রদ্দা লাগাতাম। যাই হোক, এই ট্রফিটা আমি আমার বলেই মনে করি। তাই এটা চুপিচুপি নিয়ে যাচ্ছি। এতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তবে আগামীকাল বেলা বারোটার মধ্যে জেমিনি হোটেলের বারো নম্বর ঘরে এসো। ট্রফিটি যদি নিতান্তই ফেরত পেতে চাও, তাহলে আমার সঙ্গে আর—একবার তোমাকে কুস্তি লড়তে হবে। যদি তুমি জেতো, তাহলে তোমাকে ট্রফি তো ফেরত দেবই, ওস্তাদ বলেও মেনে নেব। আর যদি তুমি হারো, তাহলে আমাকে ওস্তাদ বলে সেলাম জানাবে। ইতি শের সিং।'

এই চিরকুট পেয়ে অম্বিকাচরণ তো মহা খাপ্পা। বাতাসে ঘুষি ছুড়তে ছুড়তে বলতে লাগলেন, 'ব্যাটা শের সিংয়ের এত সাহস! সেদিন লড়াইতে যে ওর লেংটি খুলে নিইনি, তাই ওর সাত জন্মের ভাগ্যি! এমন প্যাঁচ মেরেছিলাম যে ব্যাটা একেবারে কুমড়ো গড়াগড়ি। আবার বলে কিনা সেদিন ওই নাকি জিতেছিল। আয় না ব্যাটা, এখনও এই বুড়ো বয়সে ভেলকি দেখিয়ে তোকে এরোপ্লেন—প্যাঁচ মেরে ধোবিপাটে আছড়ে মারতে পারি কি না, দেখে যা!'

বরদাচরণ তাড়াতাড়ি দাদুকে ধরে বসিয়ে পাখার বাতাস—টাতাস দিয়ে একটু ঠান্ডা করে বললেন, 'সেদিন কী ঘটেছিল তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এতদিন পরে লোকটা আবার কুস্তি লড়তে চায় কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। শের সিংয়ের বয়স এখন কত হবে বলো তো?'

অম্বিকাচরণ একটু চিন্তা করে বললেন, 'আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়ো তো হবেই। তা তার এখন নব্বইয়ের কম না।'

চোখ কপালে তুলে বরদাচরণ বললেন, 'নব্বই! এই বয়সেও লোকটা কুস্তি লড়তে চায়? নাঃ দাদু, লোকটা দেখছি সাংঘাতিক।'

অম্বিকাচরণ মাথা নেড়ে বললেন, 'সাংঘাতিক তো বটেই। শের সিংয়ের নাম শের সিং হল তো খালি হাতে একটা রয়েল বেঙ্গল বাঘ মেরে। আসামের জঙ্গলে বুনো মোষের সঙ্গেও নাকি একবার হাতাহাতি করেছিল। এমন দাপট ছিল যে, সহজে তার সঙ্গে কেউ লড়তে রাজি হত না।'

বরদাচরণ বললেন, 'এরকম লোককে একবার চোখের দেখা দেখে আসার দরকার। চলো দাদু, কাল তোমার সঙ্গে আমিও যাব।'

পরদিন অম্বিকাচরণ নাতি বরদাচরণের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন। জেমিনি হোটেল তাঁদের বাড়ি থেকে বেশি দূরেও নয়। দোতলায় উঠে বারো নম্বর ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে অম্বিকাচরণ বাজখাঁই গলায় চেঁচাতে লাগলেন, 'কোথায় শের সিং? বেরিয়ে আয় ব্যাটা। অম্বিকাকে চিনিস না! আর তোরই একদিন কী আমারই একদিন।'

ঘরের ভিতর থেকে একটা হুঙ্কার শোনা গেল। 'এসেছিস? সিংহের গুহায় শেষে ঢুকবার মতো সাহস হল তোর।'

বলতে বলতে দড়াম করে দরজা খুলে গেল!

শের সিংকে দেখে বরদাচরণের চোখ ছানাবড়া। পঁচাশি বছরেও তাঁর দাদু অম্বিকাচরণের স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভালো বটে, কিন্তু নব্বুইতে শের সিং যেন প্রকৃতই সিংহ। ইয়া বুকের ছাতি, বিশাল দুটো শালখুঁটির মতো হাত, পাকানো মোচ, বাবরি চুল।

দু—জনেই দু—জনের দিকে কিছুক্ষণ রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে রইলেন। পাছে এখানে দু—জনেই লেগে যায়, সেই ভয়ে বরদাচরণ তাড়াতাড়ি দু—জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

শের সিং জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কে?'

অম্বিকা বললেন, 'নাতি।'

শের সিং সঙ্গে সঙ্গে ভারি নরম হয়ে বললেন, 'নাতি! তা আগে বলতে হয়। এসো খোকা, এসো, তোমার দাদুর সঙ্গে ঝগড়া আছে বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তো নেই। তা ছাড়া শিশুরা হচ্ছে জগতের আনন্দ।'

'খোকা' 'শিশু' এইসব বিশেষণ শুনে বরদাচরণ হাসবেন কী কাঁদবেন তা বুঝতে পারছেন না।

ঘরে ঢুকে বরদা দেখেন বেশ লম্বাচওড়া চেহারার এক যুবক বসে বসে একটা পেতলের গামলায় ঘুঁটুনি দিয়ে বাদামের শরবত বানাচ্ছে। শের সিং বললেন, 'অম্বিকা, এই দ্যাখো, এ হচ্ছে আমার নাতি। ও ভাবে, আমি বুড়ো হয়েছি, তাই সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে।'

অম্বিকাচরণ যুবকটির থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, 'বাঃ বাঃ দিব্যি দেখতে হয়েছে তো খোকাটিকে!'

শের সিং বললেন, 'কাজিয়া পরে হবে। আগে শরবত খাও।'

অম্বিকা বললেন, 'শরবত না হয় খাচ্ছি। কিন্তু আমার বাড়িতে এ ক—দিন যে দুটো ডালভাত খেতেই হবে শের সিং।'

এরপর দু—পক্ষের বেশ সদ্ভাব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে দু—জন নানা কথা কইলেন। হাসিঠাট্টাও হল। গল্পগুজবে অনেকটা বেলা কাবার করে অম্বিকা উঠলেন। বরদাচরণ স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন, দুই বুড়োর কুস্তিটা বোধহয় এড়ানো গেল।

কিন্তু বিদায় দেওয়ার সময় শের সিং হঠাৎ বললেন, 'তাহলে অম্বিকা, কুস্তিটা কবে হচ্ছে?'

অম্বিকাচরণ সতেজে বললেন, 'যেদিন বলবে। কাল বললে কাল।'

'তাহলে কালই, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দাও। ফুটবল মাঠে দু—জনে নেমে পড়ব।'

'তাই হবে।'

খবরটা বিদ্যুৎবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অতীতের বিখ্যাত পালোয়ান শের সিং যে এখনও বেঁচে আছেন তাই অনেকে জানত না, তার ওপর অম্বিকাচরণ যে একদা শের সিংকে হারিয়েছিলেন সে খবরও অনেকের অজ্ঞাত। সুতরাং তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। রাতারাতি ফুটবলমাঠের মাঝখানে কুস্তির মাটি তৈরি হয়ে গেল। চারদিকে চেয়ার বেঞ্চি সাজানো হতে লাগল। ভিড় সামলানোর জন্য বাঁশের বেড়া তৈরি হল। সকাল থেকে ছেলে—মেয়ে—বুড়ো—বাচ্চচা কাতারে কাতারে এসে চারদিকে জায়গা দখল করতে লাগল। পঁচাশি বছরের একজন মানুষের সঙ্গে নব্বুই বছর বয়সি আর—একজনের লড়াই। সোজা কথা তো নয়!

কিন্তু মুশকিল হল, অম্বিকাচরণের সকাল থেকেই শরীর খারাপ, সকাল থেকেই রোদে বসে বার বার বগলে থার্মোমিটার দিচ্ছেন। বরদাচরণকে ডেকে বলছেন, 'দ্যাখ তো দাদু, কত উঠল।'

বরদাচরণ থার্মোমিটার দেখে বলেন, 'সাড়ে সাতানব্বইতেই তো দাঁড়িয়ে আছে দেখছি।'

'থার্মোমিটারটা তাহলে একেবারেই গেছে। আমার তো মনে হয় একশো এক—এর কম না। দে তো, আবার লাগিয়ে দেখি।'

বরদাচরণ দাদুর কপালে হাত দিয়ে বলেন, 'রোদে বসে গা একটু গরম হয়েছে বটে, কিন্তু জ্বর বলে তো মনে হয় না।'

অম্বিকাচরণ খেঁকিয়ে উঠে বলেন, 'তুই জ্বরের কী বুঝিস? এ হল নাড়ির জ্বর। ভিতরে ভিতরে গুমরে—গুমরে ওঠে।'

বরদাচরণ বুঝলেন, দাদু লড়তে চান না, কিন্তু না লড়লেও নয়। চারদিকে খবর রটে গেছে। কাতারে কাতারে লোক আসছে লড়াই দেখতে।

বরদাচরণ বা অম্বিকাচরণ জানেন না যে, ওদিকে শের সিংয়ের শিবিরেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভোররাত্রি থেকে শের সিং তাঁর নাতিকে বলছেন, 'দ্যাখো ভাই, আমার পেটে খুব ব্যথা হয়েছে।'

নাতি বলল, 'জীবনে তোমার কোনোদিন তো পেটে ব্যথা হয়নি দাদু।'

শের সিং খিঁচিয়ে ওঠেন, 'হয়নি বলেই কী হতে নেই? আমার দারুণ ব্যথা হয়েছে, মনে হয় কলেরাই হল বোধহয়।'

'কলেরা হলে তো ভেদবমি হয়।'

'তুই খুব বেশি জেনে গেছিস। কলেরা কতরকমের হয় জানিস? ভিতরে ভিতরে আমার ভেদবমি শুরু হয়ে গেছে।'

নাতি ফাঁপরে পড়ে গেল। লড়াই না হলে যে দাদুর সম্মান থাকবে না।

'বেলা বাড়তে লাগল। অম্বিকাচরণ কম্বলমুড়ি দিয়ে সেই যে শুয়ে পড়েছেন, আর নড়াচড়ার নাম নেই। এদিকে শের সিং সেই যে বাথরুমে ঢুকে দরজা দিয়েছেন, আর বেরোনোর কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

অগত্যা বরদাচরণ দাদুর অবস্থার কথা জানাতে শের সিংয়ের কাছে রওনা হল, আর শের সিংয়ের নাতিও নিজের দাদুর কথা জানিয়ে ট্রফিটা ফেরত দিয়ে আসতে রওনা হল অম্বিকাচরণের বাড়ি।

বরদাচরণ যখন শের সিংয়ের ঘরে এসে হাজির হলেন, তখনও শের সিং বাথরুমে।

বরদাচরণ খুব বিনয়ী গলায় ডাকলেন, 'শেরদাদু! ও শেরদাদু!'

বাথরুমের ভিতর থেকে খুব সতর্ক গলায় শের সিং সাড়া দিলেন, 'কে রে? কী চাই?'

বরদাচরণ খুব কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'শেরদাদু, আমি বরদাচরণ, আমার দাদু অম্বিকাচরণের সকাল থেকেই টাইফয়েড।'

'অ্যাঁ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তাররা বলছে, ব্যামো খারাপের দিকে যেতে পারে।'

'সত্যি বলছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের ভিতরে একটা রণহুঙ্কার শোনা গেল। তারপর দড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে শের সিং হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে বললেন, 'আরে এ তো আমি আগেই জানতাম। অম্বিকার মুরোদ কী তা সেই ষাট বছর আগেই আমার জানা হয়ে গেছে। লড়াইয়ের নামে যার জ্বর আসে সে আবার মরদ! ছোঃ ছোঃ।'

ওদিকে শের সিংয়ের নাতি কাচুমাচু মুখে গিয়ে অম্বিকাচরণের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'অম্বিকাদাদু! ও অম্বিকাদাদু!'

'কে?' কম্বলের ভিতর থেকে অম্বিকাচরণ ক্ষীণস্বরে বললেন, 'কে?'

'আমি শের সিংয়ের নাতি। দাদুর যে ভোর—রাত্রি থেকে খুব ভেদবমি হচ্ছে। ডাক্তার বলছে কলেরা।'

'সত্যি তো?'

'আজ্ঞে সত্যি। দাদু তো বাথরুম থেকে বেরোতেই পারছেন না।'

কম্বলটা এক ঝটকায় নামিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন অম্বিকা। তারপর হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললেন, 'হবে না? ভয়ের চোটে পেটখারাপ হয়েছে। আমার আগেই জানা ছিল। মুর্শিদাবাদে সেই যে ওকে ধোবিপাটে আছাড় মেরেছিলাম, তা কী আর ও ভুলে গেছে?'

শের সিং আর অম্বিকাচরণ দু—জনেই ভাবলেন, লড়াইটা যখন হবেই না তখন ফুটবলমাঠে গিয়ে জনসাধারণের সামনে বুক ফুলিয়ে ওয়াকওভার নিয়ে আসবেন।

দু—জনেই তড়িঘড়ি রওনা হয়ে পড়লেন আসরে। অম্বিকা জানেন শের সিংয়ের কলেরা। শের সিং জানেন অম্বিকার টাইফয়েড। দু—জনেই তাই নিশ্চিন্ত।

ফুটবলমাঠ ভিড়ে ভিড়াক্কার। দু—দিক থেকে দু—জনকে ঢুকতে দেখে লোকেরা হইহই করে উঠল। অম্বিকা ভাবলেন, তাঁকে দেখেই লোকে হইচই করছে। শের সিং ভাবলেন, তাঁকে দেখে।

হুঙ্কার দিয়ে দু—জনেই লাফিয়ে পড়লেন দঙ্গলে। তারপরই দু—জনে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন পরস্পরের দিকে। কেউই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

অম্বিকাচরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটা হাত শের সিংয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'দ্যাখো তো নাড়িটা। জ্বর মনে হয় একশো এক ছাড়িয়ে গেল।'

শের সিং নাড়ি ধরে বললেন, 'দুইয়ের কম না। এবার আমার পেটটা একটু টিপে দ্যাখো তো, বড্ড ব্যথা।'

অম্বিকা শের সিংয়ের পেট টিপে দেখে বললেন, 'ও বাবা, কলেরার একেবারে মস্ত একটা ডেলা দেখছি যে!'

ব্যাপারটা বুঝতে জনসাধারণের একটু সময় লাগল বটে, তারপর হোঃ হোঃ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সমস্ত মাঠ।

কবচ

আরে হরিপদবাবু যে! প্রাতঃপ্রণাম, প্রাতঃপ্রণাম!

প্রাতঃপ্রণাম। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলুম না মশাই?

তার তাড়াহুড়ো নেই, ক্রমে ক্রমে চিনবেন। আগে কুশলপ্রশ্নাদি সেরে নিই তারপর তো অন্য কথা। তা বলি আপনার খিদেটিদে ঠিকমতো হচ্ছে তো? রাতে বেশ সুনিদ্রা হয় তো? কোষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে তো?

দেখছেন তো মশাই, বাজার যাচ্ছি। এখন কী আর এত খতেনের জবাব দেওয়ার সময় আছে?

কিন্তু হরিপদবাবু, প্রশ্নগুলোকে তুচ্ছ ভাববেন না। এসব প্রশ্নের পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্যও থাকতে পারে তো। এই যে ধরুন, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে রাতে ভালো ঘুমোননি, নানারকম দুশ্চিন্তা করেছেন। আপনার তেমন খিদেও হচ্ছে না বলে মুখখানা আঁশটে করে রেখেছেন। কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে না বলে আপনার মেজাজটাও বেশ তিরিক্ষি। ঠিক কি না!

তা খুব একটা ভুলও বলেননি বটে। আপনার মতলবখানা কী বলুন তো?

চলুন, বাজারের দিকে হাঁটতে—হাঁটতেই দুটো কথা কয়ে নিই।

কথা কওয়ার উদ্দেশ্যটা কী একটু বলবেন? খামোখা একজন উটকো লোকের সঙ্গে হাপরহাটি বকে মরার সময় আমার নেই।

আহা, চটে যাচ্ছেন কেন? ষষ্ঠীচরণ যে আপনার কাছে পাঁচ হাজার টাকা পায় আর সুদসমেত সেই পাঁচ হাজার যে পঞ্চাশ হাজার দাঁড়িয়ে যেতে বসেছে, আর পচা গুন্ডা যে ষষ্ঠীচরণের হয়ে আপনার গলায় গামছা দিয়ে প্রতি মাসে অন্যায্য টাকা আদায় করছে, সে তো আর আমার অজানা নয়।

দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। এসব গুহ্য কথা আপনি জানলেন কী করে? মেয়ের বিয়ের সময় মোটে পাঁচটি হাজার টাকা ষষ্ঠীচরণের কাছে ধার নিয়েছিলুম। তখন কী আর জানতুম যে ওই পাঁচ হাজারের ফেরে আমার ঘটিবাটি চাঁটি হওয়ার জোগাড় হবে! ঠিকই বলেছেন মশাই, আমার খিদে হচ্ছে না, ঘুম উধাও, কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার লক্ষণই নেই।

শুধু কি তাই হরিপদবাবু? গণকঠাকুর সদানন্দ সরখেল যে শনির দৃষ্টি কাটানোর জন্য প্রায় জবরদস্তি একখানা নীলা ধারণ করিয়েছিলেন তারও কিস্তি টানতে গিয়ে আপনি কী কম নাকাল হচ্ছেন। সদানন্দ আবার ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে, কিস্তি ঠিকঠাক না দিলে মহাক্ষতির অভিশাপ লাগবে। তার ওপর ধরুন আপনার বাড়ির পাশেই মহাকালী ব্যায়ামাগারের আখড়া। তারা জোর করে আপনার জমির আড়াই ফুট বাই ষাট ফুট দখল করে বসে আছে, আর আপনি প্রতিবাদ করলেই তেড়ে আসছে, এও তো সবাই জানে কিনা।

আশ্চর্য মশাই, আমি আপনাকে না চিনলেও আপনি তো দেখছি আমার সব খবরই রাখেন! তা মশাই, এতসব জানলেন কী করে? আপনি কি শত্রুপক্ষের লোক?

ছিঃ—ছিঃ, হরিপদবাবু এরকম অন্যায় সন্দেহ আপনার হল কী করে? আপনার ভালো চাই বলেই না আর পাঁচটা গুরুতর কাজ ফেলে আপনার সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি! আপনার গিন্নির বাঁ—হাঁটুর বাত আর অম্বলের অসুখের জন্য ডাক্তার বদ্যি আর ওষুধের পিছনে আপনার যে হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে সে খবর জানি বলেই না আপনার দুঃখে দুঃখিত হয়ে না এসে থাকতে পারলাম না।

কিছু মনে করবেন না মশাই, আজকাল লোক চেনা খুব শক্ত বলে একটু ধন্দ ছিল। এখন বুঝতে পারছি, আপনি তেমন খারাপ লোক নন।

নই—ই তো! এই যে গেল হপ্তায় আপনি অফিসের লেজারে একটা চল্লিশ হাজার টাকার ক্রেডিট এন্ট্রি ভুল করে ডেবিটের ঘরে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তার জন্য গণেশবাবু কী অপমানটাই না আপনাকে করলেন। ইডিয়ট, গুড ফর নাথিং, অপদার্থ, মিসফিট, নন—কমিটেড ইত্যাদি কী বলতে বাকি রাখলেন বলুন! তার ওপর হেড অফিসে জানিয়ে আপনাকে পায়রাডাঙায় বদলি করার হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। আর আপনি ভালোই জানেন, পায়রাডাঙায় বদলি হওয়া মানে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ওঃ মশাই, আপনি নির্ঘাত অন্তর্যামী। এত খবর রাখেন দেখে আমি কেবল অবাকের পর অবাক হচ্ছি। সত্যিই মশাই, গণেশবাবুর মতো এমন অকৃতজ্ঞ লোক হয় না। এই তো গত ইয়ার এন্ডিং—এ গণেশবাবুর মান বাঁচাতে পরপর চারদিন অফিসের সময় পার করেও দু—তিন ঘণ্টা করে বেশি খেটে তাঁর কাজ তুলে দিয়েছি। এই কী তার প্রতিদান? আর ভুলটাও এমন কিছু মারাত্মক নয়। সেদিন জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্নে যাব বলে একটু তাড়াহুড়ো ছিল। বিকেল ছ—টা ছাব্বিশের ট্রেন ধরব বলে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে সামান্য একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল।

সেই কথাই তো বলছি। তারপর ধরুন, এপ্রিলের তেইশ তারিখে সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে রথতলার মোড়ে কী কাণ্ডটা হল?

কিছু হয়েছিল নাকি? কী হয়েছিল বলুন তো?

সে কী মশাই, এতবড়ো ঘটনাটা ভুলে মেরে দিলেন। আপনার তো এখনও ভীমরতি ধরার বয়স হয়নি। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর তিন মাস, এর মধ্যেই স্মৃতিবিভ্রম তো ভালো কথা নয়। অবশ্য জলাতঙ্কের ইনজেকশান নিলে অনেক সময়ে শরীরে নানারকম কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়, তাতে স্মৃতিবিভ্রম হওয়াও বিচিত্র নয়।

আমি যে জলাতঙ্কের ইনজেকশান নিয়েছিলাম এ খবরও আপনি জানেন দেখছি! নাঃ, আমার আরও অবাক হওয়ার উপায় নেই মশাই। ইতিমধ্যে অবাক হওয়ার অপটিমামে পৌঁছে গেছি।

আহা, অবাক হওয়ার দরকারটাই বা কী আপনার! এপ্রিলের তেইশ তারিখে সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে রথতলার মোড় দিয়ে আসার সময় আপনি যে দূরে শ্যামাদাস মিত্তিরকে দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে 'শ্যামাদাস, ওহে শ্যামাদাস' বলে চিৎকার করে ছুটে গিয়েছিলেন, তা কি আপনার মনে নেই?

দোষটা কিন্তু শ্যামাদাসেরই, বুঝলেন মশাই, গত অক্টোবরে পাহাড়ে বেড়াতে যাবে বলে আমার কাছে দূরবিনটা ধার চেয়েছিল। দূরবিনটা আমার ঠাকুরদার। সাবেক জিনিস, একটা স্মৃতিচিহ্নও বটে। কিন্তু শ্যামাদাস এমন বেআক্কেলে যে, দূরবিনটা ছ—মাসের মধ্যে ফেরত দিল না। চাইলেই বলে, দেব দিচ্ছি। তারপর শুনলুম তার বড়ো শালা নাকি দূরবিনটা তার কাছে চেয়ে নিয়ে গেছে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যাবে বলে। বলুন তো, টেনশন হওয়ার কথা নয়! তাই সেদিন তাকে দেখে ওরকম ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলুম।

আর তার ফলেই না আপনি রাস্তার একটা নেড়ি কুকুরের লেজ মাড়িয়ে ফেললেন। আর কুকুরটাও ঘ্যাক করে আপনার ডান পায়ে কামড় বসিয়ে দিল।

ওঃ, সে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনাই বটে। তবে আপনি যে অন্তর্যামী সে বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহই নেই। এসব ঘটনা আমার বাড়ির লোক আর অফিসের কলিগরা ছাড়া কেউ জানে না। কুকুরের

কামড়ের চেয়েও অনেক বেশি যন্ত্রণা হল পেটে অতগুলো ইনজেকশন নেওয়া। সে কী অসহ্য অবস্থা তা কহতব্য নয়।

না হরিপদবাবু, আপনি নবুবাবুর কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনার দুর্ভোগের জন্য নবুবাবুর অবদানের কথাটাও একটু ভাবুন। সেবার অ্যানুয়াল পরীক্ষায় নবুবাবুর ছেলে গজা অঙ্কে বাইশ পেয়েছিল। নবুবাবু তখন আপনাকে গজার প্রাইভেট টিউটর রাখেন। অঙ্কের মাস্টার হিসেবে আপনার খুবই সুনাম। গজাকে অঙ্ক শেখানোর জন্য আপনাকে নবুবাবু মাসে সাতশো টাকা দিতেন। তা দেবেন নাই বা কেন। নবুবাবুর টাকার লেখাজোখা নেই, আর গজাও তার একমাত্র ছেলে। কিন্তু হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্কে এগারো পেল এবং অ্যানুয়েলে পেয়েছিল মাত্র তিন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নবুবাবু আপনাকে ছাড়িয়ে তো দিলেনই, তার ওপর প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করলেন। অভিযোগ ছিল, আপনি ইচ্ছে করেই গজাকে ভুলভাল শিখিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর গোয়ালে আগুন লাগানোর অভিযোগে এক দফা, তাঁর বুড়ি পিসির মৃত্যু হওয়ায় সেটাকে খুনের মামলা সাজিয়ে আর—এক দফা, তাঁর বাড়িতে যে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল সেই বাবদে তিনি আর—এক দফা আপনাকে অভিযুক্ত করে এফআইআর করেন। পুলিশ একবার আপনাকে নিয়ে গিয়ে থানার লক আপে এক রাত্রি আটকেও রাখে। ঠিক কি না?

আর বলবেন না মশাই, আমার দোষ কী বলুন! গজা বেশিরভাগ দিনই অঙ্ক কষতে বসে ঘুমিয়ে পড়ত বা পেট ব্যথা বলে আমাকে বিদায় করে দিত। নবুবাবুকে বলেও লাভ হত না। বলতেন, ছেলেমানুষ, ওরকম তো একটু করবেই। ওই ফাঁকে—ফাঁকে শিখিয়ে দেবেন। কী কুক্ষণে যে গজাকে পড়াতে রাজি হয়েছিলুম কে জানে। নবুবাবু আমার জীবনটাই অসহ্য করে তুলেছেন।

সম্প্রতি তিনি আপনার বিরুদ্ধে একটা জালিয়াতির মামলা করার জন্যও তৈরি হচ্ছেন বলে শুনেছি।

ওরে বাবা!

তাই তো বলছি, আপনি কেমন আছেন সেটা জানা বড়ো দরকার।

যে আজ্ঞে। ভেবেচিন্তে মনে হচ্ছে আমি বিশেষ ভালো নেই। আমার ঘুম হচ্ছে না, খিদে হচ্ছে না, কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে না। বুক দুরদুর করে, শরীর দুর্বল লাগে, মাথা ঘোরে।

আহা, তার জন্য চিন্তা কী হরিপদবাবু। আমি তো আছি।

আপনি আছেন, কিন্তু কীভাবে আছেন?

আপনার দুঃখদুর্দশা দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল বলেই তো হিমালয়ে পাহাড়িবাবার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম।

বলেন কী? আমার জন্যে আপনি হিমালয় ধাওয়া করেছিলেন? আপনি তো অতি মহৎ মানুষ মশাই। কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনিও না!

তাতে কী? আমার চেনা—অচেনা ভেদ নেই। আপনার দুঃখের কথা পাহাড়িবাবার শ্রীচরণে নিবেদন করতেই উনি টানা পাঁচ বছরের ধ্যানসমাধি থেকে জেগে উঠে খুব চিন্তিত মুখে বললেন, তাই তো? হরিপদর সময়টা তো বিশেষ ভালো যাচ্ছে না! এর একটা বিহিত তো করতেই হয়।

বলেন কী মশাই?

তবে আর বলছি কী! পাহাড়িবাবার মহিমা তো জানেন না। সাক্ষাৎ শিবস্বয়ম্ভো! তিনি প্রসন্ন হলে আর চিন্তা কীসের? তা তিনি সব শুনেটুনে আপনার ওপর প্রসন্ন হয়েই এই একস্ট্রা স্পেশাল বগলামুখী কবচখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে কাঁচা দুধ, দই আর গঙ্গাজলে শোধন করে ধারণ করবেন। দেখবেন সব গ্রহ—বৈকল্য কেটে গিয়ে আপনি একেবারে অন্য মানুষ।

আপনি তো বড়ো পরোপকারী মানুষ মশাই।

আর লজ্জা দেবেন না। মানুষের জন্য আর কতটুকুই বা করতে পারি। যাই হোক, প্রণামী বাবদ সামান্য পাঁচ হাজার টাকা ফেলে দিলেই হবে।

অ্যাঁ!
আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওয়ারিশান

ঘরের বাহিরে পা রাখতেই প্রফুল্লবাবু দেখতে পেলেন, চারদিকে বেশ একটা হাসিখুশি ভাব। টমেটোর মতো টুকটুকে রাঙা রোদ উঠেছে, আমলকি গাছে বসে একটা দোয়েল পাখি ফচকে ছেলেদের মতো শিস দিচ্ছে, ঘাসের ওপরে হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের ফোঁটার মতো শিশির জমে আছে, হিমেল একটা হাওয়া সজনে আর নিমগাছের সঙ্গে নানা কথা কইতে কইতে বয়ে যাচ্ছে। আরও যেসব দৃশ্য প্রফুল্লবাবুর চোখে পড়ল তাতে তাঁর খুশি হওয়ার কথা নয়। যেমন নগেন ঘোষাল দাঁত খিঁচিয়ে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে দাঁতন করছেন, পরাণ মিত্তির তাঁর বাড়ির বারান্দায় মাদুরে বসে উচ্চচকণ্ঠে ছেলে পটলকে ইংরিজি গ্রামার পড়াচ্ছেন, নিমাই সরখেলের বুড়ি পিসি কতক বককে বকা—ঝকা করতে করতে সামনের উঠোনে গোবরছড়া দিচ্ছেন। এসব নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য। তবু আজ এসব দৃশ্য তাঁর ভারি ভালো লাগল। বাস্তবিক প্রফুল্লবাবু আজ খুবই প্রফুল্ল বোধ করছেন।

প্রফুল্লবাবুর প্রফুল্ল হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। তাঁর অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। বাজারে বেশ কিছু ধার—দেনা আছে। চাষবাস থেকে তেমন আয় হয় না। টাকার অভাবে বাড়িটা মেরামত করতে পারছেন না, বর্ষাকালে ঘরে জল পড়ে। পয়সার জোর না থাকলে মানুষের কাছে মানসম্মানও বজায় রাখা যায় না। লোকে ভারি তুচ্ছ—তাচ্ছিল্য করে। তিনি গরিব হলেও তাঁর খুড়োমশাই বেজায় বড়োলোক। লোহার কারবার করে লাখো লাখো টাকা করেছেন। তবে পঞ্চানন বিশ্বাস প্রফুল্লবাবুর মুখদর্শনও করতেন না। তার কারণ প্রফুল্লবাবুর যৌবনকালে খুব যাত্রা—থিয়েটার করার নেশা ছিল, আর যেটা তাঁর বাবা বা কাকা কেউই পছন্দ করতেন না। প্রফুল্লবাবু লুকিয়ে গিয়ে যাত্রাদলে নাম লেখান এবং মেয়েদের ভূমিকায় চুটিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। যাত্রা করছেন বলে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি ওই পুরুষ হয়ে মেয়ে সেজে অভিনয় করতেন বলে বাবা আর কাকা দু—জনেই তাঁর ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে ওঠেন। বাবা মারা যাওয়ার আগে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র অবধি করে ছেড়েছিলেন, আর পঞ্চানন বিশ্বাস তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক রহিত করে দেন। প্রফুল্লবাবু অবশ্য যাত্রাদলে বেশিদিন টিকতে পারেননি। কারণ ক্রমে ক্রমে মহিলার ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় শুরু করতে থাকায় প্রফুল্লবাবুর কদর কমে যায়। তিনি যাত্রা ছেড়ে সংসারে মন দেন। কিন্তু তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেননি। সম্প্রতি খবর এসেছে তাঁর নিঃসন্তান খুড়োমশাই তাঁর নামে আশি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। খবরটা পেয়ে আশি লক্ষ টাকা মানে ঠিক কত টাকা তা তলিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রফুল্লবাবু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। বিশ—পঞ্চাশ বা দুশো—পাঁচশো টাকা অবধি ভাবতে প্রফুল্লবাবুর বিশেষ অসুবিধে নেই। ক্ষেত্রবিশেষে দু—চার—পাঁচ হাজার অবধিও ভেবে ফেলতে পারেন। কিন্তু তা বলে আশি লাখ! ওরে বাবা! আশি লাখ তো পাহাড়—পর্বত! প্রথম মাথা ঘুরে পড়লেন, তারপর খেতে বসে কয়েকবার বেজায় বিষম খেলেন, আর প্রায়ই আনমনে চলাফেরা করতে গিয়ে ঘরের চৌকাঠে, রাস্তায় পড়ে থাকা ইটে, ইঁদুরের গর্তে হোঁচট খেয়ে পা মচকালেন, তেলকে জল, জলকে তেল বলে ভুল করলেন।

তবে যাই হোক, তিন দিন ধরে তাঁর মনটা ভারি প্রফুল্ল রয়েছে। যখন—তখন ফিক ফিক করে হেসে ফেলছেন, আপনমনে বিড়বিড় করে মাথা নাড়া দিচ্ছেন, আনন্দটা একটু বেশি ঠেলে উঠলে ছাদে গিয়ে কয়েক পাক চরকি নাচও নেচে নিচ্ছেন।

আজ রোববার পঞ্চানন বিশ্বাসের ম্যানেজার অঘোরবাবু আশি লাখ টাকার চেক নিয়ে আসছেন। শর্ত একটাই, গাঁয়ের পাঁচজন বিশিষ্ট লোক যদি প্রফুল্ল বিশ্বাসকে শনাক্ত করেন তবেই চেকটা হস্তান্তর করে অঘোরবাবু রসিদ নিয়ে চলে যাবেন। অঘোরবাবুর চিঠিতে এই শনাক্তকরণ ব্যাপারটার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ অঘোরবাবু প্রফুল্লবাবুকে চেনেন না, আর খুড়োমশাইও প্রফুল্লবাবুর মুখদর্শন করবেন না। তবে সেটা কোনো সমস্যাই নয়। এই গাঁয়ে তাঁর দীর্ঘকাল বাস। সবাই এক ডাকে তাঁকে চেনে। অঘোরবাবুর চিঠি পাওয়ার পরই প্রফুল্লবাবু গাঁয়ের পাঁচজন বাছা বাছা মাতব্বরকে গিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। নগেন ভটচায, বীরেশ মিত্তির, বৈকুণ্ঠ গোঁসাই, সদানন্দ সমাদ্দার আর পাঁচুগোপাল দত্ত। এঁরা সবাই মান্যগণ্য লোক। নগেন ভটচায দারোগা ছিলেন, বীরেশ মিত্তির ছিলেন ওভারসিয়ার, বৈকুণ্ঠ গোঁসাইয়ের তেলকল আছে, সদানন্দ সমাদ্দার পঞ্চায়েতের পাণ্ডা, পাঁচুগোপাল দত্ত একজন নামকরা নাট্যকার, মেলা পালা লিখেছেন।

কিন্তু প্রফুল্লবাবুর এখন চিন্তা হল আশি লক্ষ টাকা নিয়ে। আশি লাখ অনেক টাকা বটে, কিন্তু একটু খুঁতও আছে। টাকাটা লাখই বটে, কোটি নয়। লোকে তাঁকে লাখোপতি বলবে ঠিকই, কিন্তু কোটিপতি বলবে না। কিন্তু কোটিপতিটা শুনতে আরও একটু ভালো। তাই প্রফুল্লবাবু প্ল্যান এঁটে রেখেছেন, টাকাটা হাতে পেয়ে খরচাপাতি একদম করবেন না। বরং আরও শক্ত হাতে খরচ কমিয়ে আশি লাখকে এক কোটিতে নিয়ে তুলবেন। বাজার থেকে মাছ—মাংস আনা ইতিমধ্যেই বন্ধ করেছেন, তেরো টাকার চাল আনতেন, এখন আট টাকার মোটা চাল ছাড়া আনেন না, দুধের বরাদ্দ কমিয়ে অর্ধেক করে ফেলেছেন, কাজের লোক ছাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আরও খরচ কী করে কমানো যায় তা নিয়ে দিনরাত্তির মাথা ঘামাচ্ছেন। এ নিয়ে বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি এবং অশান্তি বড়ো কম হচ্ছে না। তাঁর গিন্নি তো তাঁকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন বলে নিত্য টানাহ্যাঁচড়া করছেন। বলছেন, কোথায় এক কাঁড়ি টাকা পেয়ে একটু ভালো—মন্দ বাজার করবে, গয়নাগাঁটি গড়িয়ে দেবে, বাড়িটা বেশ সারিয়ে—টারিয়ে ঝাঁ—চকচকে করবে, তা নয় এ যে আরও পেচেশপনা শুরু হল!

যে যাই বলুক প্রফুল্লবাবু তাতে কান দিচ্ছেন না। টাকা জিনিসটাই ভারি অস্থায়ী, আজ আছে তো কাল নেই। সেই যে ইস্কুলের নীচু ক্লাসে অঙ্ক কষেছিলেন, একটা আশি গ্যালনের চৌবাচ্চচায় মিনিটে সাড়ে সাত

গ্যালন জল ঢোকে আর আট গ্যালন জল বেরিয়ে যায়, চৌবাচ্চচাটি খালি হতে কত মিনিট লাগবে? অঙ্কটার কথা ভেবে আজ একটু শিউরে উঠলেন প্রফুল্লবাবু। সুতরাং বেরিয়ে যাওয়ার ফুটোটা আরও ছোটো করতে হবে এবং ঢোকার ফুটোটা বড়ো করা দরকার।

আজকাল ব্যয়সংকোচের নানা ফন্দিফিকির তাঁর মাথায় ঘুরছে। আগে তাঁর বাড়িতে নিয়মিত কয়েকজন ভিখিরি আসত। এক মুঠো চাল বা সিকিটা—আধুলিটা দেওয়াও হত তাদের। আশি লাখ টাকার খবর পাওয়ার পর প্রফুল্লবাবু তাদের হুড়ো দিয়ে তাড়িয়ে ছেড়েছেন। তারা আর এ বাড়িমুখো হয় না।

অর্থাগম বাড়ানোর জন্য প্রফুল্লবাবু বন্ধকী কারবার খুলবেন বলে ঠিক করে ফেলেছেন। লোকের হঠাৎ বিপদে পড়ে টাকার দরকার হলে সোনাদানা বন্ধক রেখে চড়া সুদে ধার নেবে। এ কারবারে লোকসানের ভয় নেই, ষোলো আনা লাভ। টাকা সময়মতো শোধ করতে না পারলে তাদের সোনাদানাও প্রফুল্লবাবুর হাতে এসে যাবে। এই প্রস্তাবে অবশ্য তাঁর গিন্নির সায় নেই। উনি ভারি বিচলিত হয়ে বলেছেন, না না, ও ভারি সব্বোনেশে ব্যবসা। লোকের বিপদ—আপদের সুযোগ নিয়ে টাকা রোজগার করা ভারি খারাপ, তাতে অমঙ্গল হবে। কিন্তু প্রফুল্লবাবু কানে তোলেননি। কোটি টাকা পার না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সোয়াস্তি নেই।

নগেন ভটচাযের বেশ দশাসই লম্বাই—চওড়াই চেহারা, কাঁচাপাকা পেল্লায় গোঁফ আর বাবরি চুল। বীরেশ মিত্তির রোগা—ভোগা মানুষ, তাঁরও গোঁফ আছে বটে, কিন্তু ঝোলা গোঁফ। তেলকলের মালিক বৈকুণ্ঠ গোসাঁইয়ের চেহারাখানাও বেশ তেল—চুকচুকে, নাদুসনুদুস, দাড়ি—গোঁফের বালাই নেই, মাথাজোড়া টাক। সদানন্দ সমাদ্দারের কেঠো রসকষহীন নিরানন্দ চেহারা, সর্বদাই ভারি ব্যস্তসমস্ত ভাব। পাঁচুগোপাল দত্ত ভারি ঠান্ডা সুস্থির মানুষ, মুখে সর্বদা পান আর মিঠে হাসি। বেলা দশটার মধ্যেই একে একে এসে পড়লেন সব।

নগেন ভটচায বাজখাঁই গলায় বললেন, কই হে প্রফুল্ল, আপ্যায়নের কী ব্যবস্থা হয়েছে শুনি! আমার আবার সকালে দুটি হাফ বয়েল ডিম না হলেই চলে না।

প্রফুল্লবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। অ্যাপায়নের ব্যবস্থা যে তিনি করেননি তা নয়, তবে একটু চেপে—চুপে। দুটি করে সন্দেশ আর একটি করে শিঙাড়া। আমতা আমতা করে বললেন, তা সে ব্যবস্থাও হবে।

বীরেশ মিত্তির মাথাটা ঘন ঘন নাড়া দিয়ে বললেন, হ্যাঁ! হাফ বয়েল ডিম আবার একটা বস্তু হল! ডিম ভাঙলেই ফচ করে খানিকটা সিকনির মতো বেরিয়ে আসে। ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! বলি সকালবেলায় লুচি দিয়ে মোহনভোগ খেয়েছ কখনো?

সদানন্দ সমাদ্দার অত্যন্ত অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, ওহে এই বয়সে ওসব গুরুভোজন কোনো কাজের কথা নয়। ডিমে কোলেস্টরেল বৃদ্ধি, লুচি আর মোহনভোগে হাই ক্যালোরি, বরং দুধ কলা দিয়ে পোটাক ছাতু মেরে দাও, সারাদিনের মতো পেট ঠান্ডা।

পাঁচুগোপালবাবুর মুখে পান, খাবার—দাবারের কথায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করলেন না। খুব ঠান্ডা মিষ্টি গলাতেই বললেন, তা কীরকম খরচাপাতি করবে হে প্রফুল্ল?

প্রফুল্লবাবু আমতা আমতা করে বললেন, কীসের খরচাপাতির কথা বলছেন বলুন তো পাঁচুদা।

বীরেশবাবু বললেন, আহা, গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপটার কথাই তো বলা হচ্ছে হে। পড়ো—পড়ো অবস্থা, সংস্কার না করলেই নয়, টাকার জোগাড় ছিল না বলেই হয়নি। তোমার টাকা পাওয়ার খবর পেয়েই আমরা এস্টিমেট নিয়েছি, তা ধরো কমসম করেও সাড়ে তিন লাখে দাঁড়াচ্ছে!

নগেন ভটচায মশাই ভারি উদার গলায় বললেন, আহা, সেই সঙ্গে রাসেশ্বরীর মন্দিরের এস্টিমেটটাও জুড়ে দাও না হে। চূড়াটা কবে ভেঙে পড়ে গেছে, পশ্চিমের দেয়ালে ফাটল, পুকুরঘাটের সিঁড়ি ভেঙে ধসে গেছে। তা ওই লাখ চারেক হলেই হয়ে যাবে মনে হয়। এক—আধ লাখ এদিক—ওদিক হতে পারে।

সদানন্দ মিষ্টি করে হেসে বললেন, আরে, প্রফুল্লর টাকা তো গাঁয়েরই টাকা, কী বলো? গরিব গাঁ আর কার ভরসা করবে! ফটক বাজার থেকে কালীতলা অবধি রাস্তাটার হাল দেখেছো? বর্ষাকালে অগম্য। দশ

থেকে বারো লাখ ফেলে দিলেই রাস্তা একেবারে রেড রোড হয়ে যায়। নিরঞ্জন ঠিকাদার তো মুখিয়ে বসে আছে হে।

নগেনবাবু বললেন, আহা, ও আর চিন্তার কী আছে! আশি লাখ টাকার মালিকের কাছে ও তো নস্যি!

বীরেশ মিত্তির পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে কী দেখছিলেন, মুখ তুলে বললেন, ও আরও একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল হে। প্রগতি সংঘের ক্লাবঘর আর নবীন যুবদলের খেলার মাঠ। বেচারারা বহুকাল হা—পিত্যেশ করে আছে। ক্লাবঘরের জন্য লাখ তিনেক আর খেলার মাঠ বাবদ মাত্র দেড় লাখ।

পাঁচুগোপাল পানের পিক ফেলে এসে বললেন, আসল কথাটাই তো এখনও তুললে না তোমরা! বিদ্যাপতি ইনস্টিটিউশনের এক্সটেনশন বিল্ডিং আর বয়েজ হস্টেল। ও দুটো না হলেই নয়। গাঁয়ের মান থাকছে না। দুটো মিলিয়ে বাইশ—তেইশ লাখে দাঁড়াবে গিয়ে।

বীরেশবাবু কী যেন যোগ করতে চাইছিলেন, ঠিক এমন সময়ে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। প্রফুল্লবাবু গিয়ে দরজা খুলে বললেন, কাকে চাই?

আজ্ঞে আমি অঘোর সরকার, পঞ্চানন বিশ্বাসের ম্যানেজার। এটা কি প্রফুল্ল বিশ্বাসের বাড়ি?

প্রফুল্লবাবু অম্লান বদনে বললেন, না। প্রফুল্লবাবু মারা গেছেন।

যতীনবাবুর চার হাত

যতীনবাবুর দোষটা কি জানেন?

আজ্ঞে না, দোষটা কী বলুন তো!

যতীনবাবুর সবচেয়ে বড়ো দোষ হল উনি বড্ড ভালোমানুষ।

অ। তা ভালোমানুষিটা দোষের খাতে ধরছেন কেন?

ধরব না মশাই? কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, ব্যাংকে দিব্যি মোটা টাকার আমানত ছিল, কয়েক লাখ টাকা শেয়ারেও খাটছিল। গাড়ি—বাড়ি—জমিজমায় একপ্রকার ভাসাভাসি কাণ্ড, কিন্তু ওই যে, ভালোমানুষির দোষ। কেবল বলেন আমি একা ভালো থাকলে তো হবে না, অন্যদেরও ভালো রাখতে হবে। আর যেমনি কথা তেমনি কাজ। দু—হাতে আর কতই বা বিলানো যায়। ভগবান যদি চারখানা হাত দিতেন তবে বিলিয়ে সুখ হত।

বটে! তা তার ঠিকানাটা কী বলুন তো!

আহা! আগে সবটা শুনুন, তবে তো!

কিন্তু দেরি করলে সব বিলি হয়ে যাবে যে!

আরে না মশাই, না। বিলি হয়েই যেত, কিন্তু ভগবান যে তাঁর আবদার মঞ্জুর করবেন সেটা যতীনবাবু ভেবে দ্যাখেননি। এখন যে তাঁর বড়ো বিপদ চলছে।

কেন মশাই, বিপদ কীসের?

বলছি মশাই, বলছি। তার আগে একটা কথা শুনে রাখুন। ভগবান মানুষটা কিন্তু বড্ড বেখেয়ালের লোক। বড়ো গলা করে চেয়েচিন্তে দেখবেন, কথাটা ভগবান কানেই তুলবেন না হয়তো। কিন্তু হঠাৎ হয়তো আনমনে ফিসফিস করে কিছু একটা চেয়ে বসলেন, অমনি সেটা মঞ্জুর করে দিলেন। তাতে যে কত বিভ্রান্তি হয় সেটা মোটেই ভেবে দেখলেন না।

তা হলটা কী মশাই?

ওই চারটে হাত চেয়েছিলেন যতীনবাবু, ওইটেই তাঁর কাল হল। রাত্রিবেলা শুয়ে ঘুমোচ্ছেন হঠাৎ বগলের তলায় সুড়সুড়ি। প্রথমটায় তেমন বুঝতে পারেননি। অস্বস্তি বোধ করে এপাশ—ওপাশ করছেন, হঠাৎ দুই বগল ফুঁড়ে ভচাক ভচাক করে আরও দুটো হাত বেরিয়ে এল। প্রথমটায় তো চোরের হাত মনে করে চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। বাড়ির লোকজনও সব লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়ে এল। কিন্তু কাণ্ড দেখে সবাই তাজ্জব। চোর—ডাকাতের ব্যাপার নয়। যতীনবাবুর দুই বগলের তলা দিয়ে গায়ের গেঞ্জি ছিঁড়ে—খুঁড়ে আরও দুটো হাত বেরিয়ে এসেছে।

যাঃ, এ আপনি গুল দিচ্ছেন।

আপনি তো গুল বলেই খালাস। যতীনবাবুর অবস্থা দেখলে বুঝতে পারতেন এটা গুল হলেই বরং ভালো ছিল।

কেন মশাই, দু—দুটো বাড়তি হাত থাকলে কাজকর্মের বেশ সুবিধেই হওয়ার কথা।

কাজকর্মের কথা আর বলবেন না মশাই। কাজকর্মের আগে আরও জ্বলন্ত সব সমস্যা রয়েছে। প্রথম কথা যতীনবাবু সব জামারই দুটো করে হাতা। কিন্তু চারটে হাতকে দুটো হাতায় গলানো যাচ্ছে না বলে সকালেই দর্জিদের ডেকে পাঠানো হল। তারাও পড়ল সমস্যায়। জীবনে চার হাতাওয়ালা জামা বানায়নি, প্রথম সমস্যা হল সেটা।

আহা, হাতাগুলো একটু বেশি ঢোলা করে নিলেই তো হয়।

না, হয় না। নতুন হাত দুটো মহা বজ্জাত। তারা পুরোনো হাতের সঙ্গে এক হাতায় ঢুকতেই রাজি নয়। তারা মুঠো পাকিয়ে দর্জিদের দিকে তেড়ে যাওয়ায় সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। যাই হোক, শেষ অবধি চার হাতওয়ালা জামা তৈরি করা হল বটে, কিন্তু চার হাতার গেঞ্জি অমিল। যতীনবাবুর আবার গেঞ্জি ছাড়া চলে না, শেষ অবধি হোসিয়ারিতে অর্ডার দিয়ে অনেক কষ্টে গেঞ্জিরও বন্দোবস্ত হল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য ক্ষেত্রে।

সেটা কীরকম?

বলছি। যতীনবাবু এখন একুনে দু—খানা ডান হাত আর দু—খানা বাঁ—হাত, বুঝলেন তো!

দিব্যি বুঝেছি। দুটো ডান, দুটো বাঁ, সোজা হিসেব।

হিসেবটা যদি এত সোজা হত তাহলে আর চিন্তা ছিল কী? প্রথম মুশকিল হল খেতে বসে। যতীনবাবু পুরোনো ডান হাত দিলে জলখাবারের একখানা লুচি আলুর ছেঁচকি সাপ্টে সবে মুখে তুলেছেন অমনি তাঁর নতুন ডান হাত ফস করে আরও দু—খানা লুচি পায়েস মেখে তাঁর মুখে দিল গুঁজে। এখন আপনি বলুন আলুর ছেঁচকি সঙ্গে পায়েস মিশে গেলে সেটা খেতে কেমন হয়।

তাই তো! কথাটা ভেবে দেখার মতো।

দুপুরে সবে ঘি মাখা ভাতের গরাস মুখে তুলতে যাবেন এমন সময় তার বিকল্প ডান হাত একগোছা সজনে ডাঁটার চচ্চচড়ি তার মুখে গুঁজে দিলে যতীনবাবুর মনের অবস্থাটা কী হয় বলতে পারেন।

খুব খারাপ হওয়ার কথা।

আর শুধু কী তাই? টেলিফোন ধরতে যাবেন, সেই ফোন নিয়ে দুই ডান হাতে এমন কাড়াকাড়ি হল যে হাত ফসকে টেলিফোনটাই পড়ে ভেঙে গেল। বাঁ—হাতে ঘড়ি পরবেন সে উপায় নেই, এক হাতে ঘড়ি পরতে গেলেই আর—এক হাত খাবলা মারে। একটু তবলা বাজানোর শখ আছে যতীনবাবুর। কিন্তু এখন দুটো ডান হাত এবং দুটো বাঁ—হাত মিলে তবলা ডুগিতে এমন সব আওয়াজ তোলে যে কহতব্য নয়। বরাবর বাঁ—হাতে চায়ের কাপ ধরার অভ্যাস তাঁর, সবে চুমুক দেবেন অমনি নতুন বাঁ—হাতটা উঠে এসে কাপটা এমন চেপে ধরল যে গরম চা চলকে পড়ে পেটে ফোসকা হওয়ার জোগাড়। বাজার করতে গিয়েও বিপত্তি। পুরোনো হাতে বাছাই বেগুন তুলছেন নতুন হাত টপাটপ কানা বেগুন তুলে ব্যাগে ভরে দিচ্ছে। বুড়ো ঢ্যাঁড়স, পাকা পটল, ধশা আলু কী থাকছে না আজকাল তাঁর বাজারে!

এঃ হেঃ! যতীনবাবুর তো তাহলে খুব বিপদ যাচ্ছে মশাই।

তা আর বলতে। তাই বলছিলুম, ভগবানের কাছে ফস করে কিছু চেয়ে বসবেন না। বেখেয়ালের লোক, কোনটা দিয়ে ফেলেন কে জানে। যা আছে তাই নিয়েই খুশি থাকুন মশাই বুঝলেন?

খুব, খুব।

নফরগঞ্জের রাস্তা

ও মশাই, নফরগঞ্জের যাওয়ার রাস্তাটা কোন দিকে বলতে পারেন?

নফরগঞ্জে যাবেন বুঝি? তা আর বেশি কথা কী! গেলেই হয়। বেশি দূরের রাস্তাও নয়। নফরগঞ্জে একরকম পৌঁছে গেছেন বলেই ধরে নিন।

বাঁচালেন মশাই, স্টেশন থেকে এই রোদ্দুরে মাইল পাঁচেক ঠ্যাঙাচ্ছি। তিন তিনটে গাঁ পেরিয়ে এলুম, এখনও নফরগঞ্জের টিকিটিও দেখতে পাইনি।

আহা, বড্ড হয়রান হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে! এই দাওয়াতেই বসে জিরিয়ে নিন কিছুক্ষণ। বেলা মোটে বারোটা বাজে। চিন্তা নেই।

তা না হয় বসছি। তা নফরগঞ্জ এখান থেকে কতটা দূর বলতে পারেন?

অত উতলা হচ্ছেন কেন? এই মানিকপুর গাঁকে তো অনেকে নফরগঞ্জের চৌকাঠ বলেই মনে করে। তা নফরগঞ্জে কার বাড়িতে যাবেন মশাই?

সে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। গলাটাও শুকিয়ে এসেছে কিনা। তা একটু জল পাওয়া যাবে?

বলেন কী! মানিকপুরে জল পাওয়া যাবে না মানে? মানিকপুরের জল যে অতি বিখ্যাত। এখানকার জলে কলেরা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ, আমাশয়, বেরিবেরি সব সারে। এই যে ঘটিভরা জল, ঢক ঢক করে মেরে দিয়ে দেখেন দিকি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে শরীরের বল ফিরে আসে কিনা।

বাঁচালেন মশাই, তেষ্টায় বুকটা কাঠ হয়ে আছে।

কেমন বুঝলেন জল খেয়ে?

দিব্যি জল, হুবহু জলের মতোই।

জলের মতো লাগলেও ও আসলে হল জলের বাবা। একবার পেটে সেঁধোলে আর উপায় নেই। লোহা খেলে লোহাও হজম হয়ে যাবে। রোগ—বালাই পালাই—পালাই করে পালাবে। হাতির বল এসে যাবে শরীরে।

তাই হবে বোধহয়। জল খেয়ে আমার বেশ ভালোই লাগছে। এবার তাহলে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই রওনা দিতে পারি।

আহা, সে হবে'খন। নফরগঞ্জ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তা কার বাড়ি যাবেন যেন?

কুঞ্জবিহারী দাস মশাইয়ের নাম শোনা আছে কি?

কুঞ্জবিহারী? তা কুঞ্জবিহারী কি আপনার কেউ হয়? শালা বা ভগ্নীপোত বা ভায়রাভাই গোছের?

না মশাই না, কুঞ্জবিহারীকে আমি কস্মিনকালেও চিনি না। তবে প্রয়োজনেই যেতে হচ্ছে।

তা ভালো, তবে কিনা ভেবেচিন্তে যাওয়া আরও ভালো।

কেন মশাই, ভেবেচিন্তে যাওয়ার কী আছে? মানুষের বাড়িতে কী মানুষ যায় না? তার ওপর মাথায় একটা দায়িত্ব নিয়েই যেতে হচ্ছে।

সেটা বুঝতে পারছি। প্রাণের দায় না হলে কী কেউ সাধ করে নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারীর ডেরায় গিয়ে সেঁধোবার সাহস করে?

আপনি কী বলতে চাইছেন যে কুঞ্জবিহারী খুব একটা সুবিধের লোক নন!

সেকথা আবার কখন বললুম? না মশাই, আমি বড্ড পেটপাতলা মানুষ। মনের ভাব চেপে রাখতে পারিনে। কী বলতে কী বলে ফেলেছি, ওসব ধরবেন না।

বলেই যখন ফেলেছেন তখন ঝেড়ে কেশে ফেললেই তো হয়। অসোয়াস্তি কমে যাবে।

আসলে কী জানেন কুঞ্জবিহারী বোধহয় খুবই ভালো লোক। তবে নিন্দুকেরা নানা কথা রটায় আর কী!

না মশাই, আপনি চেপে যাচ্ছেন। আপনাকে বলতে বাধা নেই যে, আমার ভাইঝির সঙ্গে কুঞ্জবিহারীর ছেলে বিপ্লববিহারীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতেই আসা।

বিপ্লববিহারী ওরে বাবা!

অমন আঁতকে উঠলেন কেন মশাই! বিপ্লববিহারী কি ছেলে ভালো নয়। শুনেছি সে ভালো লেখাপড়া জানে। এমএসসি পাশ করে আরও কীসব পড়াশুনো করেছে! চাকরিও করে ভালো।

তা হবে। কত কিছুই তো শোনা যায়।

নাঃ, বড্ড মুশকিলে ফেলে দিলেন মশাই। ভাবগতিক তো মোটেই ভালো বুঝছি না। দাদাকে বারবার বললুম, ফুলির বিয়ের সম্বন্ধ অত দূরে কোরো না। কিন্তু দাদা কী আর শোনার পাত্র? বেশ ফ্যাসাদেই পড়া গেল দেখছি। ও মশাই, একটু খুলে বলুন না, এখানে বিয়ে হলে আমার ভাইঝিটা কি জলে পড়বে?

ভাইঝি তো আপনার। তাকে জলে ফেলুন, ডাঙায় ফেলুন সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমি আর কথাটি কইছি না।

তাহলে আর কী করা! যাই, নিজের চোখে অবস্থাটা একটু দেখেই আসি।

আহা অত তাড়া কীসের? দুটো মিনিট বসেই যান। আমার মেয়েকে বলেছি, শশা দিয়ে দুটি মুড়ি মেখে দিতে। দুপুরবেলায় গেরস্থ বাড়িতে শুধু মুখে চলে গেলে যে অকল্যাণ হয়। ডাব পাড়তে গাছে লোক উঠেছে। এল বলে। ডাব খেয়ে মাথাটা ঠান্ডা করুন।

না মশাই, না! দুপুর গড়িয়ে গেলে চলবে না। সেখানে যে আমার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন!

দেরি কীসের। সবে তো বারোটা। পথও বেশি নয়। কথা আছে।

আজ্ঞে, কথাই তো শুনতে চাইছি।

নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারী দাস সম্পর্কে জানতে চাইলে এ তল্লাটের গাছপালা, গোরুবাছুরকে জিজ্ঞেস করলেও মেলা খবর পেয়ে যেতেন। এই দশ—বারো বছর আগেও কুঞ্জগুন্ডা দিনে তিনটে খুন না করে জলস্পর্শ করত না। প্রতি রাতে অন্তত গোটা দুই বাড়িতে ডাকাতি না করলে তার ঘুম হত না। আর রাহাজানি, তোলা আদায় কোন গুণটা না ছিল তার! তবে এখন বয়স হওয়াতে রোখ কিন্তু কমেছে। নিতান্ত দায়ে না পড়লে আর বিশেষ লাশটাশ ফেলে না। তবে তার জায়গা এখন নিয়েছে ওই তার ছেলে বিপ্লববিহারী। তফাত হচ্ছে। বাপ মানুষ মারত দা—কুড়ুল দিয়ে, ছেলে মারে বন্দুক পিস্তল দিয়ে।

বলেন কী মশাই! দাদা যে বলল, কুঞ্জবিহারী রীতিমতো ফোঁটাকাটা বৈষ্ণব। ভারি নিরীহ মানুষ। তার ছেলেটিও নাকি ভারি বিনয়ী। আর খুব সভ্যভব্য।

হাসালেন মশাই, আপনার দাদার চোখে নিশ্চয়ই চালসে ধরেছে। এই যে আপনার মুড়ি আর ডাব এসে গেছে। রোদে তেতে পুড়ে এসেছেন, একটু খিদে তেষ্টা মিটিয়ে নেন তো?

আর খিদে তেষ্টা। আপনার কথা শুনে খিদে তেষ্টা তো মাথায় উঠেছে।

আহা, তা বললে কী আর চলে? তা ভাইঝির বিয়ে দেওয়ার জন্য কি আর পাত্র জুটল না?

সেইটেই তো ভাবছি। দাদার তো দেখছি কাণ্ডজ্ঞানই নেই।

তা কুঞ্জগুন্ডা তার ছেলের বিয়েতে কত পণ নিচ্ছে? দু—চার লাখ টাকা হবে না?

না মশাই, সেরকম তো কিছু শুনিনি! বরং দাদা একবার কথা তোলায় নাকি কুঞ্জবিহারী তার দু—হাত ধরে কেঁদে ফেলে আর কী! লোকটা নাকি বলেছে, তাদের বংশেই পণ নেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই।

হুঁঃ! আপনিও বিশ্বাস করলেন সে কথা। আইনের ভয়ে প্রকাশ্যে না নিলেও গোপনে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে ঠিকই। ধরে রাখুন, তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা হবেই।

কিন্তু দানসামগ্রী দিতেও যে বারণ করেছে। বলেছে, দানসামগ্রী আবার কীসের? আমার ছেলে যদি তার বউকে প্রয়োজনের জিনিস কিনে দিতে না পারে তবে আর তাকে যোগ্যপাত্র বলে ধরা যায় না।

হেঃ হেঃ, কথার মারপ্যাঁচ মশাই, কথার মারপ্যাঁচ। এখন ওসব বললে কী হয়। বিয়ের পর দেখবেন নানা ছুতোয় হরেকরকম ফিকির করে ঘাড়ে ধরে আদায় করবে।

আপনি তো আমাকে বড়োই টেনশনে ফেলে দিলেন মশাই। এখন এই বিয়ে কী করে ভাঙা যায় তাই ভাবছি। কথা একরকম পাকা হয়েই আছে। আজ দিন ঠিক করে নিয়ে যাওয়ার কথা আমার। পুরুতমশাই অপেক্ষা করছেন। বড়ো মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।

বিয়ে ভেঙে দেওয়াই ঠিক করে ফেললেন বুঝি!

তা ছাড়া আর উপায় কী বলুন।

আহা, শুনে বড়ো স্বস্তি পাচ্ছি। মেয়েটা বেঁচে গেল। তাহলে বরং আজ আর আপনার নফরগঞ্জে যাওয়ার দরকার নেই। বাড়ির পিছনে টলটলে পুকুরের জলে স্নান করে নিন, তেল গামছা সাবান সব আসছে ভিতরবাড়ি থেকে। তারপর দুপুরে দুটি ডাল—ভাত খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হবেন'খন। পাবদা মাছের ঝাল, সরপুঁটির সর্ষে ভাপা, রুই মাছের কালিয়া, ঝিঙে পোস্ত, সোনা মুগের ডাল, মুড়িঘণ্ট, চাটনি আর পায়েস হয়েছে। এতে হয়তো আপনার একটু কষ্টই হবে। তবু গরিবের বাড়িতে দুটি অন্নগ্রহণ না করলে ছাড়ছি না মশাই।

বাপ রে! বলেন কী? এত দূর এসে যদি ফিরে যাই তাহলে দাদা কী আর আমাকে আস্ত রাখবে। বিয়ে ভাঙতে হলে কুঞ্জবাবুর মুখের ওপরেই কথাটা কয়ে আসতে হবে। তাতে প্রাণ গেলেও কিছু নয়। আর ভোজ খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও আমার নয়। আমাকে এখনই রওনা হতে হচ্ছে।

বলছিলাম কী, উত্তেজিত না হয়ে আর একটু বসুন। বলছিলাম কী, বিয়েটা একেবারে ভেঙে দেওয়ার আগে একটু অগ্রপশ্চাৎ ভাবাও তো দরকার। হুট বলে বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাও ঠিক হবে না।

বলেন কী মশাই! এর পরও এই বিয়ে কেউ দেয়?

সেটা অবিশ্যি ঠিক। তবে কিনা কুঞ্জবিহারী বা বিপ্লববিহারীর বদনাম থাকলেও তাদের সংসারে কিন্তু অশান্তি নেই। কুঞ্জগুন্ডার বউ কুসুম তো ভারি লক্ষ্মীমন্ত মহিলা। পুজোপাঠ, ব্রাহ্মণসেবা, দানধ্যান, অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মেলা গুণ রয়েছে।

অ্যাঁ! এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘ।

যে আজ্ঞে! বিয়ে হলে আপনার ভাইঝি দুঃখে থাকবে না। কারণ, বিপ্লববিহারী বাইরে যেমনই হোক, আসলে ছেলে তেমন খারাপ নয়। ষণ্ডা হলেও সে ফিজিক্সে এমএসসি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। তার ওপর এমবিএ। স্বভাবও ভারি ভালো। ভারি বিনয়ী, ভারি ভদ্রলোক।

এ যে উলটো গাইছেন মশাই।

আহা যার যা গুণ তা তো বলতেই হবে। আর কুঞ্জবিহারীও ষণ্ডাগুন্ডা বটে, কিন্তু বৈষ্ণবও বটে। রোজ গেঁড়িমাটি দিয়ে রসকলি কাটে। ভিখিরিদের খাওয়ায়, জীবসেবা করে। গুণ কিছু কম নেই।

এ তো ফের উলটো চাপ মশাই।

উলটো চাপ নয় মশাই, মানুষের দোষের কথা শুধু বললেই তো হবে না। তার গুণের দিকটাও তো দেখা দরকার।

কুঞ্জগুন্ডার আরও গুণ আছে নাকি?

তা আর নেই। জীবনে কখনো এক পয়সা কাউকে ঠকায়নি। একটি কালো টাকাও তার তবিলে নেই। গরিবদুঃখীর জন্য প্রাণ দিয়ে করেন। গাঁয়ে চারখানা পুকুর কাটিয়েছেন, অনাথ আশ্রম খুলেছেন, স্বর্গত বাপের নামে অন্নসত্র দিয়েছেন, দুটো ইস্কুল তাঁর পয়সায় চলে। দানধ্যানের লেখাজোখা নেই মশাই।

তাহলে যে বলছিলেন লোক খুব খারাপ! খুন—টুন করেন।

আজ্ঞে তাও করে থাকতে পারেন। তবে কিনা খুনগুলো প্রমাণ হয়নি। অন্তত পুলিশের কাছে কোথাও রেকর্ড নেই। কেউ কেউ বলে আর কী।

না মশাই, আমার মাথা ঘুরছে। এবার রওনা না হলেই নয়।

আহা ব্যস্ত হবেন না। কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই। স্বয়ং কুঞ্জবিহারীই এসে ভিতর বাড়িতে বসে আছেন।

এসব কী বলছেন। কুঞ্জবিহারী এখানে এসে বসে আছেন, এর মানে কী?

আজ্ঞে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।

কীরকম?

এ গাঁয়ের নাম মানিকপুর নয়।

তাহলে?

আপনি আতাগঞ্জ পেরিয়ে ডানহাতি রাস্তা ধরে ফেলায় একটু ঘুরপথে ঝালাপুর হয়ে সোজা নফরগঞ্জেই এসে পড়েছেন যে! সোজা মানিকপুর হয়ে এলে রাস্তা দু—মাইল কম পড়ত।

তাহলে এ বাড়ি—?

আজ্ঞে এটাই কুঞ্জবিহারী দাসের বাড়ি। আমি হলুম গে তাঁর ভায়রাভাই নবকুমার হাজরা।

অ। তাই বলুন।

ডবল পশুপতি

পশুপতিবাবু নিতান্তই ভালোমানুষ। তবে দোষের মধ্যে তাঁর মনটা বড়ো ভুলো। তিনি সর্বদা এতই আনমনা যে, আচমকা যদি কেউ তাঁকে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করে, তা হলেও তিনি চট করে সেটা মনে করতে পারবেন না। একটু ভেবে বলতে হয়। পশুপতিবাবুদের অবস্থা একসময়ে বেশ ভালোই ছিল। তাঁর ঠাকুরদা পুরোনো জিনিস কেনাবেচার কারবার করে খুব পয়সা করেছিলেন। বিশাল দো—মহলা বাড়ি, গাড়ি, জমিজমা, দাসদাসীর অভাব ছিল না। তবে এখন আর তার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটা আছে, তবে সংস্কার আর মেরামতির অভাবে সেটার অবস্থা বেশ করুণ। বিশাল বাগানটা এখন আগাছায় ভরা। বহু লোক বাড়িটা ভাড়া নিতে চায়, কিনতে চায়।

এই বিশাল বাড়িতে পশুপতিবাবু একা থাকেন। সকালে উঠে তিনি ডনবৈঠক দেন, কল—ওঠা ভেজা ছোলা আর আদা খান, নিজেই রান্না করেন। একা মানুষ বলে তাঁর বিশেষ টাকাপয়সার দরকার হয় না। তাঁর একটা ছোটো লোহালক্কড়ের দোকান আছে। সামান্য আয় হয়, তবে পশুপতিবাবুর চলে যায়।

দেখতে গেলে পশুপতিবাবু ভালোই আছেন। তবে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'এই যে পশুপতিবাবু, নমস্কার। কেমন আছেন?' তখন পশুপতিবাবুর ভারি সমস্যা হয়। আসলে কেমন আছেন তা পশুপতিবাবু আকাশ—পাতাল ভেবেও ঠাহর করতে পারেন না। তাই অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলেন, 'বোধহয় ভালোই।' কিংবা, 'মন্দ নয়। খারাপও হতে পারে।' অবশ্য এই জবাব দিতে পশুপতিবাবুর এত দেরি হয় যে, প্রশ্নকর্তা হয় ততক্ষণে স্থানত্যাগ করেছেন, নয়তো জবাব শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একদিন সকালবেলা পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছেন, ঠিক সেই সময় একটা লোক বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় বোধহয় ডাকতে লাগল, 'পশুবাবু আছেন নাকি? পশুবাবু?'

ব্যায়ামের সময় কেউ বাধা দিলে পশুপতিবাবু ভয়ানক চটে যান। আজও গেলেন। মাঝপথে ব্যায়াম বন্ধ করা যায় না, আবার জবাব না দিলেও অস্বস্তি। তাই প্রাণপণে বুকডন দিতে দিতে, পশুপতিবাবু শুধু 'হুম হুম, হুম' শব্দ করতে লাগলেন।

লোকটা বুদ্ধিমান। দরজার বাইরে থেকে শব্দটা অনুধাবন করে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তারপর ব্যায়ামরত পশুপতিকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'ব্যায়াম করছেন? খুব ভালো। ব্যায়ামের মতো জিনিস হয় না। হজম হয়, খিদে পায়, জোর বাড়ে, গুন্ডাবদমাশদের ভয় খেতে হয় না। ব্যায়ামের যে কত উপকার।'

পশুপতিবাবু ব্যায়াম করতে করতে লোকটাকে একটু দেখে নিলেন। বেশ সেয়ানা চেহারার মাঝবয়সি রোগা একটা লোক। চেনা নয়।

পশুপতিবাবু বুকডন শেষ করে মুগুর ভাঁজতে লাগলেন। লোকটা সভয়ে একটু কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আপনমনেই বলতে লাগল, 'লোকে বলে বটে, পশুপতিবাবু লোকটা সুবিধের নয়, মহাকেপ্পন, হাড়বজ্জাত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক। আমি বলি, তা সবাই যে সমান হবে এমন কোনো কথা নেই। আর পশুপতিবাবুর খারাপটাই তো শুধু দেখলে হবে না। তার ভালো দিকটাও দেখতে হবে। লোকটা স্বাস্থ্যবান, সাহসী, উদার।'

পশুপতিবাবু রাগবেন কী খুশি হবেন তা বুঝতে পারলেন না। তবে হাতের মুগুরদুটো খুব বাঁই—বাঁই করে ঘুরতে লাগল। ব্যায়ামের সময় কথা বলতে নেই।

লোকটা ঘুরন্ত মুগুরদুটোর দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, 'তা মহেন্দ্র তবু', বলে বসল, 'ও হে নিতাই, তোমার পুরোনো স্বভাবটা আর বদলাল না। তুমি কেবল লোকের ভালোটাই দেখে গেলে। কিন্তু দুনিয়াটা যে

খারাপ লোকে ভরে গেছে, সেটা আর তোমার চোখে পড়ল না। পশুপতির আবার গুণটা কীসের? বাপ—পিতেমোর অতবড়ো বাড়িটা ভূতের বাড়ি করে ফেলে রেখেছে। অথচ কত লোক বাড়ি না পেয়ে কত কত কষ্টে এখানে—সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে!'

পশুপতিবাবু মুগুর নামিয়ে রাখলেন। হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। লোকটার দিকে একবার গম্ভীর চোখে তাকানোর চেষ্টা করলেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। আরও ভাবতে হবে। অনেক ভেবে তবেই তিনি কথা বলতে পারেন।

পশুপতিবাবু মাথাটাকে চাঙ্গা করার জন্য বিছানার ওপর শীর্ষাসন করতে লাগলেন।

লোকটা বলল, 'আমিও ছেড়ে কথা কইনি। মহেন্দ্রকে আমিও দু—কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি। 'ওহে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর বাইরেটাই দেখলি, ভিতরটাই দেখলি না। পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে ধানাই—পানাই করলে তো চলবে না। তিনি অল্প কথার মানুষ। দিনরাত লোক গিয়ে তাঁর কাছে ঘ্যানর—ঘ্যানর করে মাথা ধরিয়ে দেয়। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন ঠিক করতে পারেন না। তবে এই আমি যদি যাই, তা হলে আমার মুখের দিকে চেয়েই পশুপতিবাবু বুঝতে পেরে যাবেন, এই হচ্ছে খাঁটি লোক। বাড়িতে যদি ভাড়াটে বসাতেই হয় তো একে। কী জানিস মহেন্দ্র, পশুপতিবাবু কথা কম বলেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।'

পশুপতি ধনুরাসন শেষ করলেন। ময়ূরাসন করতে লাগলেন। এবং লোকটাকে কী বলবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভুজঙ্গাসনে এসে তিনি ফের উৎকর্ণ হলেন।

লোকটা আপনমনেই হেসে বলছিল, 'আমি বলি কী, পশুপতিবাবু কী আর আমার প্রস্তাব ফেলতে পারবেন? তিনি তেমন লোকই নন। লোকে তাঁর বাড়িটা কিনতে চায়, ভাড়া নিতে চায়। পশুপতিবাবু তাদের সবাইকে বলেন, ভেবে দেখি। তা ভাবতে পশুপতিবাবুর একটু সময় লাগে বইকী। ভগবান তো আর সবাইকে একরকম মগজ দেননি। তাই মহেন্দ্র যখন বলে বসল, 'তুমি পারবে না হে নিতাই', তখন আমিও বললুম, 'ওহে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর ভাবনাগুলো যদি তোরা ভেবে দিতিস তবে কাজটা কত সহজ হত। পশুপতি ছেলেমানুষ, বুদ্ধিটাও ঘোলাটে, মগজেও কিছু খাটো, ও আর কত ভাববে। আসল কথা হল, পশুপতিকে ভাববার সময় দিতে নেই।' তাই আমি আর দেরি করিনি। একেবারে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে মালপত্র আর তিনটে টানা—রিকশায় পুরো ফ্যামিলিকে চাপিয়ে এনে হাজির করেছি। জানি, পশুপতি ফেলতে পারবেন না। আমিও ফিরে যাবার নই, আর ভাড়া? পশুপতিবাবু টাকার কাঙাল নন জানি, তবু আমিই বা অধর্ম করতে যাব কোন দুঃখে? গুনে—গুনে পঞ্চাশটা করে টাকা ফেলে দেব মাসে। আর পুরো বাড়িটাও তো নিচ্ছি না। শুধু দোতলার পুব—দক্ষিণ কোণের চারখানা ঘর আর দরদালানটুকু।'

পশুপতির ব্যায়াম যখন শেষ হল, তখনও ভাবা শেষ হয়নি। তিনি লোকটার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, আপনাকে ভাবতে হবে না। মালপত্র ঠেলাওলারাই নামিয়ে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে। শুধু চাবিটা কোথায় সেটা কষ্ট করে বললেই হবে। আমার বাচ্চচারা বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। গিন্নিও আবার রগচটা মানুষ।'

পশুপতি বুঝতে পারলেন, দুনিয়াতে ভালোমানুষ হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। এ—লোকটা তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেনি, মতামতও চায়নি। বরং তাঁর হয়ে নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। পশুপতিবাবু এখন করেন কী?

বাইরে এসে তিনি দেখলেন, বাস্তবিকই তিন—চারটে ঠেলার ওপর থেকে পাহাড়প্রমাণ মালপত্র কুলিরা ধীরেসুস্থে নামাচ্ছে। গোটাপাঁচেক নানা বয়সের বাচ্চচা বাগানে নিরুদবেগ হুটোহুটি করছে। একজন মোটাসোটা বদরাগী চেহারার ভদ্রমহিলা কুলিদের ধমকাচ্ছেন, তিনি পশুপতিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ঘরদোর সব পরিষ্কার আছে তো! আর জলটল তুলে রেখেছেন তো কলঘরে?'

এর কী জবাব দেওয়া যায় পশুপতিবাবু তা ভাবতে শুরু করলেন।

ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র ওপরে উঠতে লাগল। দুমদাম শব্দ, চেঁচামেচি, হই—হট্টগোল।

পশুপতি সভয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রান্নাবান্না মাথায় উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দোকানে রওনা হয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন যে, মাথাটা আর ভাবতে পারছে না কিছু।

সন্ধেবেলা যখন পশুপতি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গোটা বাড়িটাই প্রায় নিতাইয়ের দখলে। একতলায় বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সে তাসের আসর বসিয়েছে। দোতলায় কে যেন গলা সাধছে। গোটাপাঁচেক বাচ্চচা চেঁচিয়ে পড়া করছে।

পশুপতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দিন—সাতেক আগেও একজন বাড়িটা দশ লাখ টাকায় কিনতে চেয়েছিল। আর দু—জন লোক ভাড়া নিতে চেয়েছিল মাসে দু—হাজার টাকায়। পশুপতিবাবু ভাববার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

তাঁকে দেখে নিতাই তাসের আসর একেবারে আপনজনের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'পশুপতি, এসে গেছ! বাঃ, আমি তো তোমার জন্য ভেবে মরছিলুম। পশুপতি তো ফিরতে এত রাত করে না। তা হয়েছিল কী জানো, চায়ের চিনি আর দুধ ছিল না। তা আমি গিন্নিকে বললুম, সে কী কথা, দুধ চিনি নেই তো কী হয়েছে? আমার পশুপতিভায়ার ঘরেই তো রয়েছে। সে তো আর আমার পর নয়। তাই দরজাটা খুলতে হয়েছিল ভায়া, কিন্তু কিছু মনে কোরো না।'

পশুপতি ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলেন, তালা ভাঙা। ঘর হাঁ—হাঁ করছে, খোলা। এর জন্য কী বলা যায় তা পশুপতি শত ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধকার ঘরে বসে আকাশ—পাতাল ভাবতে লাগলেন। ওপরে ধুপধাপ শব্দ, কান্না, চিৎকার, ঝগড়া, বাসন ফেলার আওয়াজ, সবই তাঁর কানে গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছিল। ভারি শান্তিতে ছিলেন এতদিন। এবার না নিজের ভিটে থেকে বাস তুলতে হয়।

একটু বাদেই নিতাইয়ের বড়োমেয়ে হলুদ আর নুন চাইতে এল। তারপর মেজোছেলে এসে দেশলাই ধার নিয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ নিতাই এসে দশটা টাকা ধার চাইল, মাসের শেষেই দেবে।

পশুপতিবাবু কষে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে, না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়ল। পশুপতি উঠে দরজা খুলে দেখল, ভারি অভিমানী মুখ করে নিতাই দাঁড়িয়ে।

'কাজটা কী ঠিক করলে পশুপতি—ভায়া?'

পশুপতি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কোন কাজের কথা হচ্ছে। নিতাই মাথা নেড়ে বলল, 'ভাড়া না হয় আরও দশ টাকা বাড়িয়েই দিচ্ছি। তা কথাটা তো মুখে বললেই পারতে। বাথরুমের দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে লাথি মারার কোনো দরকার ছিল কী? কাজটা কী ঠিক হল হে পশুপতি?'

পশুপতি খুব ভাবছিলেন, কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

নিতাই দুঃখের সঙ্গে বলল, 'আর খুব আস্তেও মারোনি। আমার কাঁকালে বেশ লেগেছে। যা হোক, ওই ষাটই দেব, মনে রাগ পুষে রেখো না ভাই।'

পশুপতিবাবু কী বলা উচিত ভাবতে লাগলেন। নিতাই চলে গেল।

পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ নিতাইয়ের বউ একটা খুন্তি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল।

'বলি পশুপতিবাবু, আপনার আক্কেলখানা কী বলুন তো! ঢের—ঢের বাড়িওয়ালা দেখেছি বাপু, আপনার মতো তো দেখিনি? কোন আক্কেলে আপনি আমগাছে উঠে রান্নাঘরে ঢিল ছুড়ছিলেন? তাও ছোটোখাটো ঢিল নয়, অ্যাত বড়ো বড়ো পাথর। তার দু—খানা আমার ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গরম ফ্যান চলকে আমার হাতে ফোসকা ধরিয়েছে। চারখানা কাচের গেলাস ভেঙেছে। একটা ঢেলা পড়েছে ডালের বাটিতে। বলি এসব কী হচ্ছে? আপনি কী পাগল না পাজি?'

পশুপতি একবারও সদুত্তর দিতে পারলেন না, তবে ভাবতে লাগলেন।

নিতাইয়ের বউ চোখ পাকিয়ে বলল, 'আমিও দুর্গা—দারোগার মেয়ে। এই বলে দিলুম, ফের ঢিল মারলে আমিও দেখে নেব।'

পশুপতি শুকনো মুখে কাজে বেরোলেন। রান্নাবান্না আর করলেন না। হোটেলেই খেয়ে নেবেন দুপুরবেলাটায়।

সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরতেই দেখেন, নিতাইয়ের তাসের আড্ডা নেই। নিতাই একা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

পশুপতি কাছে যেতেই নিতাই কাঁদো—কাঁদো মুখে বলল, 'গায়ের জোর থাকলেই কী গুন্ডামি করতে হবে ভাই?'

পশুপতি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

নিতাই বলল, 'না হয় তাসের আড্ডায় একটু গোলমাল হয়েই ছিল। তাস নিয়ে বসলে ওরকম হয়, তা বলে লাঠিসোঁটা নিয়ে ভদ্দরলোকের ছেলেদের ওপর চড়াও হওয়াটা কী ঠিক? তাস খেলা তুমি যে পছন্দ করো না, এটা আমাকে বলে দিলেই তো হত।'

পশুপতি মাথা চুলকোতে লাগলেন।

নিতাই ধরা ধলায় বলল, 'আমি অফিস থেকে এসে শুনি, তাসুড়েরা সব বসে ছিল আসর জমিয়ে আর হঠাৎ নাকি তুমি একেবারে প্রলয় নাচন লাগিয়ে দেওয়ায়, তারা সব পিঠ বাঁচাতে সরে পড়ে। আর তা ছাড়া শিবুর কান ওভাবে মলাও তোমার ঠিক হয়নি। আমার সেজোছেলে দুষ্টু ঠিকই, কিন্তু সেও তোমার ছেলের মতোই ভাই, কানটা শুধু ছিঁড়ে নিতে বাকি রেখেছ, ক্যানেস্তারা বাজানো তুমি যে পছন্দ করো না তা তো আর বেচারা জানত না।'

পশুপতি খুবই অবাক হলেন এবং ভাবতে লাগলেন।

একটু রাতের দিকে পশুপতি রান্না করতে বসে হঠাৎ শুনতে পেলেন, ওপরে একটা তুমুল চেঁচামেচি আর দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে। কে একজন চেঁচাল, 'বাবা রে, মেরে ফেললে।' আর একজন বলে উঠল, 'এসব ঠিক কাজ হচ্ছে?' আর একজন, 'ও কী, পড়ে যাব যে খাট থেকে!' আর একজন, 'আমার বিনুনিটা যে কেটে দিল, ও মা!' সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দৌড়ে নামতে নামতে বলল, 'ছেড়ে দাও ভাই, মাপ করে দাও ভাই, ঘাট হয়েছে। কালই সকালবেলায় তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আর জীবনে এ—মুখো হব না।'

পশুপতি ভাবতে ভাবতেই খেলেন, ঘুমোলেন।

সকালবেলা উঠে দেখলেন, বাড়ি ফাঁকা, নিতাই কাকভোরেই বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে চলে গেছে।

পশুপতি অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভেবে যদিও তিনি কোনো কূলকিনারা করতে পারছিলেন না, তবু ব্যায়াম করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে ফিক ফিক করে হেসে ফেলছিলেন।

নিত্যানন্দ পালের খোঁজে

আচ্ছা মশাই, মহেশ চাটুজ্জের বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন?

মহেশ চাটুজ্জের বাড়ি খুঁজছেন? কেন মশাই, এ শহরে এত বাড়ি থাকতে মহেশ চাটুজ্জের বাড়িই খুঁজছেন কেন? মহেশ কিন্তু বজ্জাতের ধাড়ি। আপনি কি পাওনাদার নাকি?

আজ্ঞে ঠিক তা নয়। আসলে মহেশ চাটুজ্জের সঙ্গে আমার চেনাজানাও নেই। তবে তাঁর বাড়িটা খুঁজে পেলে শ্যামবাবুর খোঁজ পাওয়া সহজ হত আর কী! মহেশ চাটুজ্জের বাড়ির উলটোদিকে নীলমণি লেন। সেই নীলমণি লেন ধরে ঠিক একশো চুয়াল্লিশ পা হাঁটলে বাঁ হাতে চারু ঘোষের বাড়ি পড়বে। চারু ঘোষকে চেনেন কি?

চারু ঘোষ! তাঁকে চিনতে চাইছেন? তা এত মানুষ থাকতে হঠাৎ চারু ঘোষকেই বা চিনতে চাইছেন কেন? ওরকম হাড়কেপ্পনকে কেউ চিনতে চায়?

আজ্ঞে না, চারু ঘোষকে না চিনলেও ক্ষতি নেই। তবে তার বাড়িটা খুঁজে পেলে, বাড়ির দক্ষিণদিকে পুবমুখো রাস্তাটাও পাওয়া যাবে কিনা। আর ওই রাস্তাতেই দিকপতি ঘোষালের বাড়ি। চারু ঘোষের বাড়ি থেকে বড়োজোর এক ফার্লং হবে।

দিকপতি ঘোষালের সঙ্গেই বা আপনার কীসের দরকার মশাই? ষণ্ডাগুন্ডা লোক। ওর সঙ্গে মাখামাখি না করাই তো ভালো।

না না, দিকপতি ঘোষালকে আমার মোটেই দরকার নেই। আসলে দিকপতি ঘোষালের মামাতো ভাই হলেন ভবেন লাহিড়ী।

সর্বনাশ, এর মধ্যে আবার ভবেন লাহিড়ীকেও এনে ফেললেন! না মশাই, আপনি তো বিপদে পড়বেন দেখছি! এই তো চার মাস জেল খেটে এল! আপনি যদি পুলিশের লোক হয়ে থাকেন তাহলে অন্য কথা, নইলে ভবেন লাহিড়ীর খোঁজ করাটা ঠিক কাজ হবে না।

ঠিকই বলেছেন, আসলে ভবেন লাহিড়ীর ঠিকানাটার হদিসটা জানতে পারলে একটু সুবিধে হত আর কী! শুনেছি ভবেন লাহিড়ী তিরানব্বই—এর এক বাই দুই বাই তেইশ নম্বর বলভদ্র নস্কর স্ট্রিটে থাকেন। আর ও—বাড়িরই পিছন দিককার রাস্তা ধরে সাতচল্লিশ পা এগোলে নকুল নাগের ভূষিমালের দোকান, তাই না?

ভূষিমালের দরকার হলে নকুল নাগ কেন, বিস্তর নাগ—নাগিনী আছে। নকুল নাগের দোকান থেকে ভূষিমাল কিনতে হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি দেওয়া আছে কি? নকুল নাগ দিনে—দুপুরে লোক ঠকায়।

আজ্ঞে না। কেনাকাটার জন্য আসিনি মশাই। কেনাকাটার ব্যাপার নয়। আসলে নকুল নাগের দোকানের পরই পরেশবাবুর গোডাউন, সেটা ছাড়িয়ে বিশ পা হাঁটলেই অন্নপূর্ণা পাইস হোটেল, আর ওই পাইস হোটেলের ডান ধার ঘেঁষে বাঞ্ছা ঘোষ লেন গোঁত্তা খেয়ে ঢুকে গেছে।

খাওয়া—দাওয়া করতে চান তো! তার জন্য এখানে বিস্তর হোটেল আছে! অন্নপূর্ণা পাইস হোটেলেই খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অতি রদ্দি দোকান মশাই, পচা মাছ, বাসি ভাত, ময়লা বাসন।

খাওয়া—দাওয়া মাথায় উঠেছে মশাই, মহেশ চাটুজ্জের বাড়ি খুঁজে না পেলে যে সমূহ বিপদ!

বিপদ! বলেন কী মশাই? এ তো ভারি ভালো খবর! কারও বিপদ—আপদের কথা শুনলেই আমার মনটা ভারি নেচে ওঠে। তা কীরকম বিপদ আপনার?

আজ্ঞে সমূহ বিপদ। ওই মহেশ চাটুজ্জের বাড়ির নিশানা ধরে চারু ঘোষের বাড়ি খুঁজে বের করে, সেই বাড়ির খুঁটি ধরে দিকপতি ঘোষালের—

আহা, ও তো একবার হয়ে গেছে! আপনি ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণা হোটেলে পৌঁছেও গেছেন। আসলে যেতে চাইছেন কোথায়?

আজ্ঞে সেটাই তো ফেঁদে বলছিলাম। অন্নপূর্ণা হোটেল পেয়ে গেলে আর কোনো চিন্তা নেই। ওখান থেকে হেলেদুলে হাঁটলেও দুলাল বিশ্বাসের বাড়ি পাঁচ মিনিটের পথ।

ওরে বাবা! দুলাল বিশ্বাসের মতো প্যাঁচালো লোক যে ভূ—ভারতে নেই! ভালো কথারও এমন বাঁকা মানে করবে যে হাঁ হয়ে যেতে হয়। তা দুলাল বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার কী দরকার আপনার মশাই?

সে তো বটেই, দুলাল বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার তেমন কোনো ইচ্ছেও নেই আমার। তবে কিনা দুলাল বিশ্বাসের বাড়ির উলটোদিকে যে মাঠটা আছে সেটা কোনাকুনি পেরোলেই রামরতনের গোয়াল। চেনেন নাকি?

আর বলবেন না মশাই, রামরতনকে তল্লাটের সবাই হাড়েহাড়ে চেনে। দুধ না খড়িগোলা জল তা বুঝবার উপায় নেই। সেই দুধ থেকেই তো তিনতলা বাড়ি করে ফেলল মশাই। খবরদার, ওর কথায় ভুলে আবার দুধের বন্দোবস্ত করে ফেলবেন না।

না, দুধের তেমন দরকারও নেই আমার, ছেলেবেলা থেকেই আমার দুধে অরুচি।

আমার আবার একটু দুধের সর না হলে রাতের খাওয়াটাই পুরো হয় না। কিন্তু রামরতনের দুধে সর খোঁজার চেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে সর খোঁজা ভালো, তা রামরতনকে আপনার কীসের দরকার?

না না, রামরতনের সঙ্গে আমার কোনো দরকারই নেই, তবে তার গোয়ালঘরটা চিনে নেওয়াটা ভালো। কারণ ওই গোয়ালঘর থেকে ঈশানকোণে কয়েক পা এগোলেই মদনবাবুর হলুদ দোতলা বাড়ি বলে শুনেছি।

ওঃ, মদন আবার বাবু! আর হাসাবেন না মশাই, মদন যদি বাবু হয় তাহলে তেলাপোকাও পক্ষী। মদনকে লোকে কি নামে চেনে জানেন? মারু মদনা। অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। ওই মদনের পাল্লায় পড়লে সর্বনাশের আর দেরি নেই জানবেন।

সে তো ঠিকই, মদনবাবুর পাল্লায় পড়ে আমার কাজটাই বা কী বলুন! মদনবাবুকে নয়, তার বাড়িখানা পেয়ে গেলে আর চিন্তা নেই। ওই বাড়ির সামনে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে না?

তা থাকতে পারে, ল্যাম্পপোস্টের অভাব কী এখানে। সর্বত্র ল্যাম্পপোস্ট পাবেন।

আজ্ঞে, তা তো বটেই। তবে ওই ল্যাম্পপোস্টটার একটা আলাদা ব্যাপার আছে।

কী ব্যাপার বলুন তো! ওই ল্যাম্পপোস্টের নীচে কিছু পোঁতা—টোঁতা আছে নাকি?

তা থাকতেও পারে, তবে আমার সে খবর জানা নেই।

তাহলে ল্যাম্পপোস্ট দিয়ে কী হবে মশাই, আপনি তো আর বিদ্যাসাগরের মতো ল্যাম্পপোস্টের আলোয় লেখাপড়া করবেন না!

আজ্ঞে না, লেখাপড়ার পাট কবেই চুকেবুকে গেছে।

তবে?

আসলে ওই ল্যাম্পপোস্টটাকে এক নম্বর ধরে পশ্চিম দিকে এগোতে—এগোতে বারো নম্বর ল্যাম্পপোস্টের লাগোয়া বাড়িটাই হচ্ছে সনাতন সরখেলের বাড়ি।

আ মোলো! সনাতন সরখেল যে মাথা—পাগলা লোক। দিনরাত আপনমনে বিড়বিড় করে, বাতাসে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটে। অঙ্কের মাস্টার ছিল, বুঝলেন? অঙ্কে ভারি পাকা মাথা। আর ওই আঁক কষে কষেই তো মাথাটা গেল। তা আপনি কি অঙ্কে কাঁচা?

বেজায় কাঁচা মশাই, বেজায় কাঁচা। তবে সেইজন্য নয়, সনাতন সরখেলের বাড়ির লাগোয়া নরেন ঘড়াই লেন, আর ওই নরেন ঘড়াই লেনের সাতচল্লিশ বি বাড়িটা হল খগেনবাবুর।

খগেনবাবু! খগেনবাবুর সারা গায়ে চুলকুনি মশাই। দিনভর কেবল ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে সারা শরীর চুলকে যাচ্ছেন, কথা কইবার ফুরসত নেই। বড়ো ছোঁয়াচে রোগ, খগেনবাবুর ধারে—কাছে যাবেন না, আপনার ভালোর জন্যই বলছি।

চুলকুনিকে আমিও বড়ো ভয় পাই। তবে রক্ষে এই যে, খগেনবাবুর সঙ্গে আমার কোনো দরকার নেই। তাঁর বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়ে বাঁহাতি তিন নম্বর রাস্তাটা ধরে এগোলেই গিরীশ বাগের বাজার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো কাছেই।

আজ্ঞে, আর সেই গিরীশবাবুর বাজার পেরিয়ে ছাতুওলা গলির মুখেই নিত্যানন্দ পালের বাড়ি।

তা তো বটেই। আর আমিই নিত্যানন্দ পাল। কিন্তু নিত্যানন্দ পালের সঙ্গে আপনার কাজটা কী?

আসলে হরিপদ বৈরাগী হল বন্ধু মানুষ। তা তার সঙ্গে আমার একটা বাজি হয়েছে। একটা কাজ করতে পারলে সে আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দেবে।

অ, তা কাজটা কী?

হরিপদ নিত্যানন্দ পালকে একদম পছন্দ করে না। নিজের ভায়রাভাই হওয়া সত্ত্বেও সে সর্বদাই বলে যে, নিত্যানন্দ পালের মতো এমন হাড়ে হারামজাদা নাকি তল্লাটে দুটো নেই। নিত্যানন্দ নাকি সাংঘাতিক ঋণডুটে, ধার নিয়ে শোধ দেয় না, হাড়কেপ্পন, লাগানি—ভাঙানি করে বেড়ায়, জলের মতো মিথ্যে কথা বলে, কথা নিয়ে কথা রাখে না, ওঃ সে বলতে গেলে মহাভারত—

তাই বুঝি! হরিপদর এত সাহস!

যে আজ্ঞে। তাই সে আমাকে বলেছে নিত্যানন্দের পেটে যদি একটা রামচিমটি কেটে পালিয়ে আসতে পারিস তবে তোকে পঞ্চাশ টাকা দেব। তাই আপনার কাছে আসা।

অ্যাঁ!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাজারদর

একশো বছর পর ঘুম ভাঙতেই রামবাবু ভারি অস্বস্তি বোধ করলেন। যে কাচের বাক্সে তিনি শুয়ে আছেন, সেটার ভিতরটা ভীষণ ঠান্ডা। তার ওপর চোখে তিনি সবকিছু ধোঁয়াটে দেখছেন, কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে, হাত—পা খিল—ধরা, মাথাটা খুব ফাঁকা।

কিছুক্ষণ একেবারে ভোম্বলের মতো শুয়ে রইলেন রামবাবু। তারপর আস্তে আস্তে শরীর গরম হল, কানের ভোঁ ভোঁ কমে গেল, হাত—পায়ের খিল ছাড়ল, সবকিছু মনে পড়তে লাগল। মনে পড়তেই তিনি ভীষণ আঁতকে উঠে বসলেন এবং চারদিকে প্যাট প্যাট করে তাকাতে লাগলেন। ১৯৭৯ সালে তাঁকে গভীরভাবে ঘুম পাড়িয়ে একটা ঠান্ডা বাক্সে ভরে মাটির নীচে একটা স্টোর রুমে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল ঠিক একশো বছর পর পরবর্তী সমাজের মানুষ তাঁর ঘুম ভাঙাবে।

একশো বছর কী কেটে গেল এর মধ্যেই? চোখের দৃষ্টি কিছু স্বচ্ছ হতেই তিনি দেখলেন, কাচের বাক্সটা একটা টেবিলের ওপর রাখা, টেবিলের চারধারে দাঁড়িয়ে সাদা পোশাক পরা কয়েকজন লোক তাঁকে গম্ভীরভাবে দেখছে।

রামবাবু প্রথমে একটা হাঁচি দিলেন, একটু কাশলেন, একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ভারি লজ্জা লজ্জা করছিল তাঁর। স্বাভাবিক নিয়মে এতদিন তাঁর বেঁচে থাকার কথা নয়। হিসেব করলে, এখন তাঁর বয়স ঠিক একশো চল্লিশ বছর। তা ছাড়া এই একশো বছর পরেকার দুনিয়ায় কত কী পালটে গেছে। কেমন লাগবে কে জানে বাবা! তিনি প্রথমেই দেখে নিলেন মানুষগুলোর এই একশো বছরের বিবর্তনে লেজ বা শিং গজিয়েছে কি না। গজায়নি। লোকগুলো খুব লম্বা বা বেঁটে হয়ে যায়নি তো? না। লোকগুলো ভালো, না খারাপ? বোঝা যাচ্ছে না। তবে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা তাঁর জানতে ইচ্ছে করছিল, সেটা হল বাজারদর। এখন চাল কত করে কিলো? আলু কত? মাছ কত? পালং, কপি, কড়াইশুঁটিই বা কীরকম?

রামবাবু একটু হেসে বললেন, 'খুব একচোট ঘুম হল বাবা। টানা একশো বছর একেবারে।'

লোকগুলো তাঁর কথার জবাব দিল না। ভারি অভদ্র। এখনও খুব খরচোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। সকলের মুখেই কাপড়ের ঢাকনা।

রামবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হাঁ করে দেখছ কী সবাই? গত একশো বছরে আমার পেটে কিছু পড়েনি তা জানো? দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটিনি। ছুটে গিয়ে খাবারদাবার নিয়ে এসো। আর শোনো, চায়ের নাম শুনেছ তো? চা? জানো? হ্যাঁ, এক কাপ গরম চা দাও সবার আগে।'

লোকগুলো মৃদু মৃদু হাসছে। রামবাবু ভাবলেন, এরা বোধহয় বাংলা ভাষা বোঝে না। তার আর দোষ কী? একশো বছরে ভাষারও কত পরিবর্তন হয়ে থাকবে। এখনকার বাংলা ভাষা হয়তো চীনে ভাষার মতোই দুর্বোধ্য। তাই তিনি একটু চীনে ভাষার মিশেল দিয়ে বললেন, 'খাবারচুং জলদিচি লাওং। গরমং চাং দরকারং।'

বলে নিজের ওপর একটু বিরক্তই হলেন রামবাবু। চীনে ভাষা তাঁর কস্মিনকালেও জানা নেই। অজানা ভাষার ভেজাল দিতে গিয়ে বাংলাটা কেমন সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে গেল না?

লোকগুলো কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। তবে অপারেশন থিয়েটারের মতো নানারকম যন্ত্রপাতিওলা ঘরটায় তারা হরেক কলকাঠি নাড়তে লাগল। রামবাবু হাই তুলে বললেন, 'আর কতক্ষণ এই প্রায় দেড়শো বছরের বুড়োটাকে তোরা দগ্ধে মারবি বাপ? খাবার না দিস একটা আয়না অন্তত দে। বুড়ো মুখটার কী ছিরি হয়েছে দেখি।'

লোকগুলো এ—কথাটা যেন কী করে বুঝতে পারল। একজন কোত্থেকে ছোট্ট গোল হাত—আয়না বের করে ধরিয়ে দিল তাঁর হাতে। রামবাবু কী দৃশ্য দেখবেন সেই ভয়ে আয়নাটা মুখের সামনে ধরেও কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। চোখ খুলবেন কী খুলবেন না ঠিক করতে—না—করতেই অবাধ্য চোখ দুটো বে—আক্কেলের মতো খুলে গেল। কিন্তু রামবাবু খুশিই হলেন। মুখের চামড়া একটু ঝুলে গেছে ঠিকই, দাড়িও একটু হয়েছে, তবে সব মিলিয়ে তাঁর চেহারায় বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি। চল্লিশ বলেই চালানো যায়।

অবশ্য এরকমই কথা ছিল। কাচের বাক্সে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তাঁকে এমনভাবেই রাখা হয়েছিল যাতে তাঁর শরীরে অতি মৃদু হৃৎস্পন্দন হয়, অতি মৃদু গতিতে রক্ত চলাচল করে, অতি মৃদু শ্বাস—প্রশ্বাস চলে এবং শরীরের ক্ষয়ক্ষতি নগণ্য মাত্রায় ঘটে। এই একশো বছর আসলে তিনি ছিলেন মৃত। কাজেই শরীরটার বয়স বাড়েনি।

একটা লোক তাঁর বাঁ হাতটা বাগিয়ে ধরে ইনজেকশন দিচ্ছে। তিনি তাকে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন বাজারদরটা কীরকম বলতে পারো হে? আলু কত করে যাচ্ছে?'

লোকটা খুব অবাক হয়ে রামবাবুর দিকে তাকাল। রামবাবু ভাবলেন, লোকটা বোধহয় বাংলা জানে না। ইংরিজিতে বললেন, 'পট্যাটো?'

লোকটা মাথা নাড়ে। রামবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, 'রাইস? ডোন্ট ইউ ইট রাইস?'

লোকটা মাথা নাড়ে। রামবাবু হাল ছেড়ে দেন। ইংরিজিও বিস্তর পালটে গেছে বোধহয়। একটা ভারি অস্বস্তি হচ্ছে মনের মধ্যে। একশো বছর আগে অজ্ঞান হওয়ার সময় তাঁর বন্ধু বৈজ্ঞানিক গয়েশ হালদারের সঙ্গে একটা বাজি ধরেছিলেন। দুশ্চিন্তা সেই বাজিটা নিয়ে।

একশো বছর পর তাঁর ঘুম ভাঙলে লোকেরা তাঁর ওপর বিস্তর এক্সপেরিমেন্ট চালাবে, এরকম কথাই ছিল। লোকগুলো চালাচ্ছিলও তাই। ইনজেকশন দিল, রক্ত নিল, ব্লাডপ্রেশার দেখল, হাঁ করাল, শুইয়ে, বসিয়ে, চিত করিয়ে, উপুড় করে, বিস্তর পরীক্ষা চালাল।

রামবাবু আপনমনে বকবক করতে লাগলেন, 'চল্লিশের মতো দেখতে বলেই কী আর চল্লিশের খোকা আছি রে বাবা? বয়সটা হিসেব করে দ্যাখ না! তারপর বুঝেসুঝে খোঁচাখুঁচি করিস।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! গোমড়ামুখো লোকগুলো নাগাড়ে তাদের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ রামবাবুর নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ পড়েনি কেন সেটাই আশ্চর্যি! একশো বছর আগে অজ্ঞান হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী বেঁচে ছিলেন, দুটো ছেলে আর চারটে মেয়ে ছিল, মাথার ওপর বুড়ো বাপ—মা, তিন ভাই আর সাত বোনও ছিল। এই একশো বছরে তাদের কারোই আর বেঁচে থাকার কথা নয়।

ভাবতেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন রামবাবু। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। একটা লোক তাড়াতাড়ি একটা টেস্ট টিউবে সেই চোখের জল ধরে রাখল।

তবে শোকটা খুব বেশিক্ষণ রইল না রামবাবুর। আত্মীয়স্বজনরা এতকাল বেঁচে থাকলে খুনখুনে বুড়োবুড়ি হয়ে যেত সব। সেটাও ভালো দেখাত না। তিনি লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার বউ—বাচ্চচারা এতকাল বেঁচে নেই জানি, কিন্তু নাতিপুতি বা তস্য পুত্রপৌত্রাদি কে আছে জানো? একটু খবর দেবে তাদের?'

একটা কিম্ভূত এক্স—রে মেশিনে তাঁকে ঝাঁঝরা করছিল লোকগুলো। পাত্তাও দিল না। তবে তারা চটপট যন্ত্রপাতি গুটোচ্ছিল। রামবাবুর মনে হল পরীক্ষা আপাতত শেষ হয়েছে। তিনি মটকা মেরে পড়ে রইলেন।

লোকগুলো কোনো সম্ভাষণ না জানিয়েই বেরিয়ে গেল। রামবাবু শুয়ে শুয়ে চোখ পিট পিট করতে লাগলেন। একশো বছরে বাইরের দুনিয়াটার কতটা পরিবর্তন হয়েছে, তা বুঝবার উপায় নেই এখান থেকে। এ ঘরে নিরেট দেয়াল আর যন্ত্রপাতি। একটা পুরু দরজা আছে বটে, কিন্তু তার ওপাশে একটা করিডোর। বাহিরে হয়তো এখন তুষার যুগ চলছে, সূর্য হয়তো নিভু—নিভু হয়ে এসেছে, মানুষ হয়তো এখন বিজ্ঞানের বলে শূন্যে হাঁটে, জিনিসপত্রের দাম হয়তো একশো গুণ করে বেড়েছে। হয়তো...!

রামবাবু শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ ঠ্যাং নাচালেন, তারপর 'দুত্তোর' বলে উঠে পড়লেন। ঘুরে ঘুরে ঘরের যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে লাগলেন। এক সময়ে তিনি নামকরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তবু এই একশো বছর পরেকার আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলোর কলাকৌশল তিনি ভালো বুঝতেই পারলেন না। একটা বোতাম টিপতেই ঝড়ের মতো শোঁ শোঁ শব্দ ওঠায় তাড়াতাড়ি সরে এলেন সেখান থেকে এবং গিয়ে দরজার হাতল ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। ভাগ্য ভালো, দরজাটা হড়াক করে খুলে গেল।

কিন্তু করিডোরে পা রেখেই আঁতকে উঠলেন রামবাবু। করিডোরের মেঝেটা ঠিক নদীর ধীর স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। তবে চলন্ত ফুটপাথ, এসক্যালেটার বা কনভেয়ার বেল্ট রামবাবুর আমলেও ছিল, তাই খুব বেশি অবাক হলেন না। মাথাটা ঘুরছিল বলে তিনি চলন্ত করিডোরে বসে রইলেন। খানিকটা ওপরে উঠে এবং অনেকটা নীচে নেমে, খানিক ডাইনে গিয়ে এবং ফের কিছুটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে করিডোর চলতে লাগল। একটু বাদে আর একটা দরজা পেলেন। করিডোর থেকে লাফ দিয়ে নেমে দরজাটা টানলেন রামবাবু। দরজাটা খুলেও গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসে রামবাবু একটা গভীর শ্বাস ছাড়লেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, যা ভেবেছিলেন তাই। না, তুষার যুগ আসেনি বা সূর্যও নিভু নিভু হয়নি। বরং একটার বদলে আকাশের চারধারে চারটে এবং মাঝখানে একটা, মোট পাঁচটা সূর্য জ্বলজ্বল করছে। আবহাওয়া খুবই মনোরম। না গরম, না ঠান্ডা। চারদিকে একশো দুশো তলা বাড়ি একেবারে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। আকাশেও তিনি বিস্তর বাড়িঘর ভেসে বেড়াতে দেখলেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে শোঁ করে নানান সাইজের রকেট উড়ে যাচ্ছে, পিরিচের মতো দেখতে কিছু জিনিসকেও উড়ে যেতে দেখলেন তিনি, আরও দেখলেন রকেট—লাগানো চেয়ারের মতো দেখতে ছোটো ছোটো আকাশ—গাড়িতে মানুষ চলাফেরা করছে।

সামনের চলমান ফুটপাথে উঠে পড়লেন রামবাবু। আশেপাশে আরও সব লোকজন রয়েছে। তারা হাঁ করে দেখছে তাঁকে। দেখবেই। তাঁর পরনে সেই একশো বছর আগেকার ধুতি আর পাঞ্জাবি। এদের পরনে শুধু জাঙ্গিয়ার মতো খাটো একটু জিনিস, গা আদুড়।

রামবাবুর পাশেই একটা বুড়ো লোক। তার বয়স সত্তর বছর হবে। তা হোক, সত্তর হলেও এ লোকটা রামবাবুর চেয়ে না হোক সত্তর বছরের ছোটো। তাই আপনি বলবেন না তুমি বলবেন, তা ঠিক করতে না পেরে রামবাবু বারকয়েক গলাখাঁকারি দিয়ে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন ক—টা বাজে?'

বুড়ো লোকটা একটু অবাক হয়ে তাকাল বটে, তবে একটু খোনাসুরে বলল, 'রাত ন—টা বেজে ছত্রিশ মিনিট তেরো সেকেন্ড।'

রামবাবু নিজে বৈজ্ঞানিক। কাজেই অবাক হলেন না। এতক্ষণে বরং বুঝলেন, আকাশে পাঁচটা সূর্য নয়, ওগুলো কোনোরকমের কৃত্রিম আলো যার ফলে চারদিকটা দিনের মতো দেখাচ্ছে। সম্ভবত ওগুলো পৃথিবীর

অন্য পাশের সূর্যের আলো থেকে এপাশে আলো প্রতিফলিত করছে। এ ধরনের একটা আইডিয়া একশো বছর আগে তাঁর মাথাতেও এসেছিল।

রামবাবু ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ তারিখটা কত বলবে বাবা?'

লোকটা অবাক চোখে ফের তাকিয়ে বলল, 'জানুয়ারি, বিশ শো উনআশি।'

রামবাবু তা জানেন। তবু লোকটার সঙ্গে একটু খেজুরে আলাপ করছেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য অন্য। একশো বছর পর পৃথিবীতে কীরকম পরিবর্তন হবে না—হবে, মানুষ কতটা এগোবে না—এগোবে, তা তাঁর মোটামুটি আন্দাজ ছিল। সুতরাং তিনি চারদিকের পরিবর্তন দেখে খুব অবাক হননি। কিন্তু গয়েশের সঙ্গে একটা বাজি ছিল। সেইটে বড়ো খোঁচাচ্ছে।

রামবাবু বললেন, 'আচ্ছা সুকিয়া স্ট্রিটটা কোনদিকে বলতে পারো বাবা?''

লোকটা বলে, ''সুকিয়া স্ট্রিট? সুকিয়া স্ট্রিট বলে কিছু শুনিনি তো!'

'নর্থ ক্যালকাটায়!'

লোকটা হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, 'ক্যালকাটা? ওঃ ক্যালকাটা নামে একটা গ্রাম আছে বটে। সে তো অনেক উত্তর দিকে।'

'এ শহরটার নাম কী বাবা?'

'এ হল গোসাবা, সুন্দরবন!'

'বটে! গোসাবার এত উন্নতি?' বলে রামবাবু চোখ কপালে তোলেন।

লোকটা হঠাৎ রামবাবুর একটা হাত খপ করে ধরে বলল, 'আচ্ছা, আপনি কী রামবাবু? একশো বছর আগে যাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল?'

রামবাবু খুব জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি সে—ই। কী করে বুঝলে বাবা?'

'বুঝব না? আপনার ঘুমন্ত মুখের ছবি যে প্রায়ই টেলিভিশনে দেখানো হয়। খবরের কাগজেও বেরোয়।'

'তাই বুঝি?' বলে খুব হাসলেন রামবাবু। বললেন, 'তা কলকাতার কী হল বলতে পারো বাবা?'

'সে তো আরও সত্তর—আশি বছর আগেই মশা, লোডশেডিং আর জলের অভাবে হেজে গিয়েছিল। শহরে জঙ্গল গজিয়ে যায়। তারপর এখন অবশ্য কলকাতা আবার বর্ধিষ্ণু গ্রাম হয়ে উঠছে। ভালো চাষবাস হচ্ছে। চৌরঙ্গির আলু খুব বিখ্যাত, বাগবাজারের কুমড়ো পৃথিবীর সেরা, খিদিরপুরে মোচার সাইজের পটল জন্মায়। তা ছাড়া কলকাতায় এখন 'মশা বাঁচাও' আন্দোলনের একটা হেড কোয়ার্টার হয়েছে।'

'বটে? সে আবার কী? মশা বাঁচাবে কেন বাবা?'

'মশা মেরে মেরে মানুষ তো মশার প্রজাতিই ধ্বংস করে দিয়েছিল কিনা। যেমন এক সময় আপনারা বাঘ—সিংহ মেরে মেরে সব প্রায় নিকেশ করেছিলেন। পরে আপনারা যেমন 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' করে বাঘ বাঁচাতে চেয়েছিলেন, এখন ঠিক সেইভাবেই মশা জিয়োনোর চেষ্টা চলছে।'

রামবাবু এবার আসল কথাটায় এলেন। খুব সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা বাবা, একটা কথা বলবে? খুব সাবধানে বোলো। তেমন শকিং কিছু শুনলে আমার বুড়ো হার্ট থেমে যেতে পারে। এখনকার বাজারদরটা কীরকম বলতে পারো?'

'বাজারদর?' লোকটা একটু অবাক হয়, হেসেও ফেলে। বলে, 'খুব চড়া।'

'খুব?' বলে রামবাবু বড়ো বড়ো চোখে তাকান। গয়েশের সঙ্গে এই নিয়েই বাজি। গয়েশ বলেছিল, একশো বছর পর বাজারদর হবে একশো গুণ, রামবাবু বলেছিলেন, কক্ষনো না। দশগুণ বড়োজোর হতে পারে। রামবাবুর বুকটা তাই টিবটিব করছিল। বললেন, 'তবু বলো বাবা, শুনে রাখি। আচ্ছা, আগে বলো চাল কত করে।'

'চাল?' লোকটা হাসিমুখেই বলে, 'চাল যাচ্ছে তিনশো টাকা।'

রামবাবু শকটা সামলাতে পারলেন না। চোখ উলটে ফেললেন, হাত—পা কাঠ হয়ে গেল, ভিরমি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে লোকটা বলল, 'কিলো নয়, কিলো নয়। কুইন্টাল।'

রামবাবু আবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে একটা শ্বাস ছাড়লেন। আর যা হোক তা হোক, বাজারদরটা ঠিক আছে।
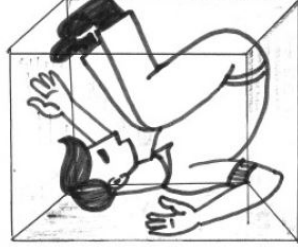
লাটুর ঘরবাড়ি

লাটু নস্কর মোটেই তেজালো লোক নয়। তাকে মেনিমুখো বললেও বেশি বলা হয় না। চেহারাখানা লম্বা চওড়া বটে, কিন্তু ভিতুর ডিম। তার তিন কুলে কেউ নেই। জমিজমা নেই, বাড়ি—ঘর নেই। বদন ঘোষের জমিতে খেতমজুরি করে পেট চলে তার। আর খালধারে যে খাপড়ার ঘরটায় সে থাকে তাও নাকি কে একজন গিরিবাবুর জমিতে।

বছর চারেক আগে তার বাবা গত হয়। তার আগে বাবার মুখেই শুনেছে, গিরিবাবু নাকি তার বাবাকে বলে গেছে জমিটা দেখেশুনে রাখিস, আমি ফিরে এসে দখল নেব। তা গিরিবাবু এসে যদি কান ধরে লাটুকে তুলে দেয় তাহলে লাটুর চারদিক একদম ফর্সা। গিরিবাবু না এলেও তার ছেলেমেয়েরাও তো এসে দখল নিতে পারে! তাই লাটু বড়ো ভয়ে ভয়ে থাকে।

আর ঘরখানারই বা কী বাহার। খাপড়ার ছাউনি আর হোগলার বেড়া। বর্ষাকালে সাপখোপ, বিছে, ব্যাঙ, কেঁচোর অবিরল যাতায়াত। তাদের সঙ্গেই মিলেমিশে থাকা। তেমন বাদলা হলে খালের জল এক লম্ফে ঘরে উঠে আসে। আর খাপড়ার ফাঁক দিয়ে জল পড়া তো আছেই। একটা বাঁশের মাচায় বস্তা পেতে তার বিছানা। খাওয়ার কোনো ঠিক—ঠিকানা নেই। রাতে মেটে হাঁড়িতে ভাত রেঁধে নুন লঙ্কা দিয়ে ফ্যানা ভাত খায়, খানিকটা ভিজিয়ে রেখে পরদিন পান্তা খেয়ে কাজে যায়। অসুরের মতো খাটুনি।

তাও তার চেহারাখানা বেশ তাগড়াই। তার কারণ, যে মাঠপুকুরের জঙ্গলে আর ঝোপঝাড়ে ঘুরে যখন যেমন ফলপাকড় পায় তা গোগ্রাসে খেয়ে নেয়। কখনো ফলসা, কখনো ডাঁশা পেয়ারা, করমচা, বুনো কুল, ডেউয়া, আঁশফল, যা পায়।

এক—একদিন আস্ত মৌচাক পেয়ে গেলে তাকে আর পায় কে? ভেজা খড়ে আগুন দিয়ে ধোঁয়া তৈরি করে মৌমাছিদের তাড়িয়ে আস্ত চাকটা নামিয়ে আনে।

এক—একদিন মেটে আলু বা মানকচু পেয়ে গেলে সেটা কোটালপুরের হাটে নিয়ে বেচে দেয়। ইটাগঞ্জের গোপাল কবিরাজমশাইয়ের জন্য মাঝে মাঝে ঘৃতকুমারী, নিমগুলঞ্চ, বিশল্যকরণী, অর্জুনছাল এনে দেয়। গাছপালা সে খুব ভালো চেনে। কবরেজমশাই দু—চার টাকা দেন মাত্র। তবে বড্ড স্নেহ করেন।

তা এইভাবেই টিকে আছে লাটু। খুব খারাপ আছে, এমন কথা তার মনে হয় না। শুধু এখন একটাই ভয়, গিরিবাবু কবে এসে ঘর থেকে তাকে তাড়ান। তবে এটাও সত্যি কথা যে, এই ঘর আর জমিটুকু থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেলেও তার অবস্থার খুব একটা হেরফের হওয়ার নয়। তখন হয়তো হাটখোলার চালার নীচে বা কারও গোয়ালঘরে, নিদেন গাছতলায় গিয়ে জুটতে হবে। তার মতো মনিষ্যির আর এর চেয়ে বেশি কিই বা হবে!

কানু মণ্ডলের স্যাঙাৎ চিকুর ম্যালেরিয়া। তাই কানু এসে লাটুকে ধরল বড়োখালে তার সঙ্গে নৌকোয় মাছ ধরতে যেতে। লাটুর আপত্তি নেই। সে সব কাজেই রাজি। সারারাত বৃষ্টি, নৌকো খানিক বেয়ে, খানিক ঠেলে খাল তোলপাড় করে কানু মাছ ধরল মন্দ নয়। দুটো মাঝারি বোয়াল, কিছু পাঙাস, মৃগেলের বাচ্চা আর চুনো মাছ মিলে চার—পাঁচ কিলো হবে। কানু হিসেবি লোক। লাটুকে একখানা বোয়াল আর কিছু চুনোপুঁটি দিয়ে বিদেয় করল। অবিশ্যি তাতে লাটুর তেমন আপত্তি হল না, তার কিছু হলেই হয়।

ভোরবেলা ঘাটে নেমেই সোজা আশু পালের বাড়ি গিয়ে পাল গিন্নিকে মাছ গছাল সে। কুড়িটা টাকা পেল। তার মনে হল, এই তো যথেষ্ট।

বাড়ি এসে ঘরের ঝাঁপটা খুলতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে কে যেন সাড়া দিল, বলি গয়েশ নস্কর বাড়ি আছে?

লাটু ফিরে দেখে ছাতা হাতে এক আধবুড়ো বাবুমতো লোক দাঁড়িয়ে আছে। এ বাড়িতে এমন মানুষের আসার কথাই নয়।

সে বলল, আজ্ঞে গয়েশ নস্কর আমার বাবা। তিনি তো গত হয়েছেন, তা তিন—চার বছর হল বোধহয়।

অ! তা এখানে তুমিই থাকো বুঝি?

যে আজ্ঞে, আমি হলুম গে লাটু নস্কর।

লোকটার পরনে একটা কালো পাতলুন, গায়ে হাফহাতা সাদা শার্ট। বলল, হ্যাঁ, বাবা বলেছিল বটে এ জমির দেখভাল করার জন্য যাকে বহাল করে গিয়েছিল সেই গয়েশ নস্করের একটা কচি ছেলেও আছে। আমি হলুম গিরি নায়েকের ছেলে যদু নায়েক। বুঝলে কিছু?

বুকটা একটু ধক করে উঠল লাটুর। না বুঝবার কথাও তো নয়। বৃত্তান্ত তো জানাই। গিরিবাবুর জমির দখল নিতে তার ছেলে এসে গেছে। লাটু ঘাড় কাত করে বলল, যে আজ্ঞে। বুঝেছি। তা আমাকে কবে ভিটে ছাড়তে হবে?

লোকটা একটু চিন্তিত ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বলল, এখানে কতটা জমি আছে বলো তো?

লাটু মাথা চুলকে বলে, আজ্ঞে কাঠার হিসেব তো ঠিক জানা নেই। তবে উত্তরে ওই যে কাঁঠালগাছটা দেখছেন এখান থেকে দক্ষিণের খালধার পর্যন্ত, আর পুবের ওই বাঁশঝাড়টা থেকে পশ্চিমের কাছে মিয়ার বাড়ির কাঁটাতারের বেড়া অবধি।

তাহলে তো বেশ অনেকটাই জমি, কী বলো হে!

তা মন্দ নয়। আমার আন্দাজ বিঘে দুই হবে।

জমিটা চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখল যদু নায়েক। তারপর তার দিকে চেয়ে বলল, তা জমিটি খামোখা পড়ে আছে কেন? একটু চাষ—বাস করতে পারলে না?

আজ্ঞে, আমি অন্যের জমিতে খাটতে যাই তো, তাই আর ফাঁক পাই না। তারপর ধরুন, আমার হালগোরু নেই, চাষের পয়সা নেই। গিরিবাবু এলেই জমি ছেড়ে দিতে হবে বলে বাবা বুঝিয়ে গেছে। তাই আর হাঙ্গামা করিনি। তা আমাকে কী আজই উঠে যেতে হবে?

কেন, তুমি কি আরও সময় চাও?

লাটু মাথা নেড়ে বলে, আজ্ঞে না, সময় নিয়ে হবেই বা কী! আমার তো গেরস্থালি নেই, জিনিসপত্রও নেই। আজ বললে আজই বেরিয়ে পড়ব।

যদু নায়েক গম্ভীর হয়ে বলে, হুঁ!

তা বাবু, আপনি কি এখন গাঁয়েই থাকবেন?

ভাবছি। হেতালডুবিতে আমাদের খানিকটা চাষের জমিও আছে। বহুকাল আদায় উসুল হয় না।

যে আজ্ঞে! বারো বিঘে জমি। পরশুরাম হেলা চাষ করে। আপনার বাবার আমলের বর্গা, পরশুরাম খুব টেটিয়া লোক।

হ্যাঁ। তাই ভাবছি গাঁয়ে আমাদের এত কিছু থাকতে গঞ্জ শহরে পচে মরি কেন? ও জায়গা আমাদের সয় না।

যে আজ্ঞে। তা আমার তো বাঁধাছাঁদার কিছুই নেই। সামান্যই জিনিস। বেরিয়ে গেলেই হয়।

তুমি তো আচ্ছা লোক হে বাপু! একজন উটকো লোক এসে বলল, আমি গিরিবাবুর ছেলে, এ জমি আমার, আর অমনি তুমি ভিটে ছেড়ে চলে যেতে পা বাড়িয়েছ!

লাটু খুব ভাবনায় পড়ে গেল। তাই তো! সে না চেনে গিরিবাবুকে, না চেনে তার ছেলেকে, এ জমির দলিল—দস্তাবেজ কোথায় তাও সে জানে না। শুধু তার বাবা বলেছিল, এ হল গিরিবাবুর জমি, একদিন ছেড়ে দিতে হবে।

মাথা—টাথা চুলকে লাটু বলে, আজ্ঞে, সে কথা ঠিক, তবে বাবু মানুষেরা তো আর ভুল কথা বলেন না।

তুমি তো দেখছি মানুষ বড়ো জব্বর চিনেছ! বাবুদের বুদ্ধি বেশি বলে তারা বদমাইশিও খুব মাথা খাটিয়ে করে।

বাবু, তাহলে কি আপনি গিরিবাবুর ব্যাটা নন?

হলেই বা। প্রমাণ ছাড়া আমাকে জমি ছেড়ে দিতে যাবে কেন?

লাটু শুকনো মুখে বলে, আজ্ঞে ধরা—ছাড়ার কথাই তো ওঠে না। জমি যে মোটেই আমার নয় মশাই!

দখলি স্বত্ব বলে একটা কথা আছে, জানো! জমি যখন যার দখলে থাকে, তখন তাকে পট করে উচ্ছেদ করা যায় না।

লাটু বলে, আমি কী আইনের মারপ্যাঁচ জানি বাবু? হুড়ো দিলেই আমরা ভয় খেয়ে যাই। নিজের জমিই রাখতে পারে না কতজন! আর এ তো পরের জমি।

পেটে বিদ্যে আর মগজে বুদ্ধি না থাকলে ওরকমই হয়।

লাটু হেসে মাথা নেড়ে বলে, আজ্ঞে ও বড়ো জব্বর কথা! আমি কী আর মনিষ্যির মধ্যে পড়ি!

তা বাপু, তোমার চলে কীসে? ঘরদোরের যা লক্ষ্মীছাড়া দশা দেখছি তাতে তো মনে হয় তোমার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

লাটু একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, সে তো ঠিক কথা বাবু। তবে কিনা এভাবেই তো এতটা বয়স অবধি কেটে গেল।

বলি, তোমার বয়স কত?

বছর কুড়ি—বাইশ হবে বোধহয়। দু—চার বছর এদিক—ওদিক হতে পারে।

তা বেশ কথা। এখন এ ঘর যদি ছেড়ে দাও তাহলে যাবে কোথা? বলি যাওয়ার কোনো জায়গা আছে?

লাটু একগাল হেসে বলে, তা দু—একটা খোঁজ যে নেই তা নয়। একজনের গোয়ালে একটু থাকার বন্দোবস্ত করে নেওয়া যাবে। নইলে শেষ অবধি গাছতলা তো আছেই।

ভারি অবাক চোখে তার দিকে চেয়ে যদু নায়েক বলে, তুমি একজন তাজ্জব লোক হে। কিছুতেই কোনো হেলদোল নেই দেখছি।

লাটু একটা শ্বাস ফেলে বলে, আজ্ঞে, মনটা খারাপ লাগছে ঠিকই। বাবার আমল থেকেই এই ঘরে আছি কিনা। এখানেই জন্ম। কিন্তু তা বলে তো আর অধর্ম করতে পারি না।

যদু নায়েক গম্ভীর হয়ে বলে, হুম, তোমার ঘরে একটু উঁকি মেরে দেখলাম, তুমি সত্যিকারের দিগম্বর মানুষ। বিষয়বুদ্ধিতে লবডঙ্কা।

লাটু হতাশ হয়ে বলে, আজ্ঞে বিষয়ই তো নেই, বুদ্ধি থাকবে কী করে?

যদু নায়েক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এবার সত্যি কথাটা বলেই ফেলি বাপু। মন দিয়ে শোনো।

লাটু একটু তটস্থ হয়ে বলে, যে আজ্ঞে।

গিরিধারী নায়েকের কোনো ছেলেপুলে ছিল না। তার আসল ওয়ারিশানও কেউ নেই। বুঝলে! আমার নাম যদু নায়েক হলেও আমি কিন্তু গিরি নায়েকের ছেলেও নই, ভাতিজাও নই। সোজা কথা হল, গিরি নায়েকের বিষয়—সম্পত্তি সবই এখন বেওয়ারিশ। ইচ্ছে করলে সরকার বাহাদুর এসব দখল করলেও করতে পারে। কিন্তু একটা বিপদ হল, অনেকেই গিরি নায়েকের ওয়ারিশান সেজে হাজির হতে পারে। তেমন তোড়জোড় হচ্ছে বলেই শুনেছি আর আমি তাই ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখে যেতে এসেছি।

চোখ গোল গোল করে লাটু যদু নায়েকের কথাগুলো শুনছিল। সে বুদ্ধিতে খাটো হলেও একথাগুলো বেশ বুঝতে পারল। খুব চিন্তিত মুখে বলল, তাহলে এখন কী হবে বাবু?

সেটাই বুঝতে আসা। কিন্তু তুমি তো দেখছি বড্ড বোকাসোকা লোক। যে—কেউ এসে তোমাকে তাড়িয়ে জমি দখল করতে পারে। আর একবার দখল নিয়ে গেড়ে বসলে সরানো ভারি কঠিন।

কাঁচুমাচু মুখে লাটু বলে, আজ্ঞে, তা তো বটেই।

তুমি উচ্ছেদ হয়ে যাও, এটাও আমার ইচ্ছে নয়।

কিন্তু কেউ এসে হুড়ো দিলে?

তুমি কি খুব ভিতু লোক?

যে আজ্ঞে।

চেহারাটা তো বেশ তাগড়া, তবে অমন মেনিমুখো কেন?

আজ্ঞে আমি এমনধারাই। নিজেকে আমার নিজেরও তেমন পছন্দ হয় না।

যদু নায়েক বলে, বলি ঘরে লাঠিসোটা কিছু আছে?

লাটু একগাল হেসে বলে, তা আর নেই! সাপখোপ, শেয়াল বাগডাশার সঙ্গে ঘর করতে হয় তো! তাই একখানা পাকা বাঁশের লাঠি আছে বটে। বাবা বলেছিল, ঠাকুরদার জিনিস। তিনি মস্ত লেঠেল ছিলেন। আর আগাছা কাটবার একখানা হেঁসো আছে। একখানা দা—ও আছে।

বাঃ! তাহলে আর চিন্তা কী? কেউ যদি এসে জমি বাড়ি দখলের কথা বলে তাহলে তুমি বাপু নেড়ি কুকুরের মতো লেজ দেখিয়ো না। লাঠি হাতে নিয়ে একখানা হাঁকাড়ে ছেড়ে বাইরে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে। তাহলেই দেখবে কাম ফর্সা।

লাটু মিটমিট করে চেয়ে বলল, সে কী আমি পারব? আস্পদ্দী হয়ে যাবে না?

তাহলে বাপু, তোমার পাততাড়ি গোটানোই ভালো। তোমার দ্বারা এ কাজ হওয়ার নয়। ভগবান তোমাকে একখানা দিব্যি লম্বা চওড়া শরীর দিয়েছেন। এ জিনিস ক—জনার কাছে বলো তো! তা ভগবান যখন দিয়েছেনই তখন তার একটা দাম তো দিতে হয় বাপু! এরকম একখানা ডাকাতে চেহারা নিয়ে ভেড়ার মতো হাবভাব করলে যে স্বয়ং ভগবানও খুশি হবেন না! যা ভালো বোঝো বাপু তাই করো। আমার যা বলার বলেছি, এখন তোমার কপাল।

যদু নায়েক চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবল লাটু। যদু নায়েকের কথাগুলো তার যেন ন্যায্য বলেই মনে হচ্ছে। ভগবান যখন চেহারাখানা দিয়েছেন, তখন সেটা কাজে না লাগানোর মানে হয় না। তবে তার বুকের জোর কম। সাহস মোটেই নেই।

দিন তিন—চার পরের কথা। লাটু কাজে বেরোবে বলে পান্তা খাচ্ছিল। এমন সময় বাইরে জনাকয়েক লোকের আগমন টের পেল সে। কারা যেন বাইরে নিজেদের মধ্যে কথা কইছে। লাটু শেষ দুটো গরাস গোগ্রাসে গিলে জল খেয়ে উঠে পড়ল।

বাইরে বেরিয়ে দেখল, জনা চারেক মানুষ। ভদ্রলোকের মতোই চেহারা। সবচেয়ে বয়স্ক গুঁফো লোকটা তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, তুই কে রে? এ জমিতে বেআইনি ঘর তুলে রয়েছিস যে বড়ো?

লাটু অন্যসময়ে হলে ভয় খেয়ে গুটিয়ে যেত। মিউ মিউ করত। কিন্তু যদু নায়েক যেমন শিখিয়ে দিয়েছে, সে তেমনটাই করল। হঠাৎ বুক টান করে দাঁড়িয়ে বলল, তাতে আপনার কী দরকার? আপনি কে?

এ জমি আমাদের। এক ঘণ্টার মধ্যে জমি ছেড়ে পালা। নইলে পুলিশ এসে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাবে।

লাটু ঘরে ঢুকে পাকা বাঁশের লম্বা লাঠিটা হাতে করে বেরিয়ে এসে বাঘা গলায় বলল, এটা দেখেছ? সব ক—টাকে এ জমিতে পুঁতে ফেলব! বেরোও! বেরোও...

মাত্র দু—পা এগিয়ে গিয়েছিল লাটু।

আর তাইতেই ভয় খেয়ে লোকগুলো এমন দুদ্দাড় পালাল যে লাটু হাসি চাপতে পারল না। এই কায়দায় যে ভালো কাজ হয় তা বুঝতে তার একটুও দেরি হল না।

আরও দিন দুয়েক পর লাটু যখন খেতে কাজ করছিল, তখন কালী স্যাঁকরার ছেলে বিশু দৌড়ে এসে তাকে খবর দিল, ও লাটু। কারা যেন তোর ঘর ভাঙছে! শিগগির যা।

লাটুর আজকাল সঙ্গেই লাঠিগাছ থাকে। গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো ছিল। লাঠিগাছ নিয়ে সে কয়েক লম্ফে তার ঠেক—এ পৌঁছে দেখে চার—পাঁচজন মুনিশ লোক তার ঘরের অর্ধেক ভেঙে ফেলেছে। একজন মুরুব্বি গোছের লোক কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো।

লাটুর দোষ নেই। ঘরখানা গেলে তার কিছুই থাকে না। সুতরাং আগুপিছু চিন্তা তার মাথায় এল না। সে সোজা লাঠি চালিয়ে চারজন মুনিশকে এমন ঘায়েল করল যে তারা 'বাপ রে, মা রে' বলে দৌড়। মুরুব্বি লোকটা 'অ্যাই, অ্যাই' বলে চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসতেই লাটু লাঠিটা আপসে বলল, জমি দখল করতে এসেছ? এই জমিতেই তোমাকে শুইয়ে দেব, বুঝলে!

কেন, দেশে থানা—পুলিশ নেই? গুন্ডামি করে পার পাবে ভেবেছ?

গুন্ডামিটা কে করল বলো তো বাবু? আমি না তুমি? কোন আইনে তুমি আমার ঘর ভেঙেছ? তোমার বাপের জমি?

আমার দলিল আছে।

আমারও আছে। এখন বিদেয় হও। আর কখনো যেন আমার জমির ত্রিসীমানায় না দেখি!

লোকটা গায়েব হয়ে গেল।

দুদিন পর যদু নায়েক সকালবেলায় এসে বলল, সাবাস! এটাই তো চেয়েছিলুম। এখন গতরে খেটে বাঁশ বাখারি ডালপালা দিয়ে জমিটি ঘিরে ফেলো। সীমানা থাকা দরকার। আর সেই সঙ্গে একজন পাহারাদারও যে চাই। সবচেয়ে ভালো পাহারাদার হল বউ। একটা বউ নিয়ে এসো হে।

লাটু লজ্জায় অধোবদন।

যদু নায়েক বলল, গিরি নায়েকের কাছে আমার কিছু টাকা দেনা ছিল। হাজার দশেক। সুদ সমেত পনেরো হাজার হয়েছে। শোধ না দিতে পারায় মনস্তাপে ভুগছি। টাকাটা তুমি রাখো। এও একরকম শোধ দেওয়াই হল। কী বলো?

লাটু হঠাৎ মুখ তুলে বলে, বাবু, আপনি আসলে ছদ্মবেশে ভগবান নন তো?

তা কে জানে বাপু।

গণেশের মূর্তি

মহাদেববাবু মানুষটি বড়ো ভালো। দোষের মধ্যে তিনি গরিব। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আর সেইজন্য বাড়িতে তাঁকে যথেষ্ট গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। তাঁর স্ত্রী মনে করেন ভালোমানুষির জন্য মহাদেববাবু কোনো উন্নতি করতে পারলেন না। একটা দোকানে সামান্য কর্মচারীর কাজ করেন তিনি। সামান্য যা পান তা থেকেও গরিব—দুঃখীকে সাহায্য করেন। কেউ ধার—টার করলে শোধ চাইতে পারেন না। দুষ্টু লোকেরা তাঁকে ঠকানোরও চেষ্টা করে। মহাদেববাবু ভালোই জানেন, এ জীবনে তিনি আর উন্নতি করতে পারবেনও না। তাঁর সেইজন্য তেমন দুঃখও নেই। তবে ছেলেপুলেরা খাওয়া—দাওয়ার কষ্ট পেলে তাঁর খুব দুঃখ হয়। বেশি পয়সার লোভ তাঁর নেই। তবে আর সামান্য কিছু বেশি টাকা যদি রোজগার করতে পারতেন তাহলেই হত।

একদিন কাজকর্ম সেরে রাত্রিবেলা মহাদেববাবু বাড়ি ফিরছেন। পথে একটা মস্ত বটগাছ পড়ে। এই বটতলায় মাঝে মাঝে এক—আধজন সাধু এসে কয়েকদিন ধুনি জ্বালিয়ে থানা গেড়ে বসে। ধর্মভীরু মহাদেববাবু সাধু—সজ্জন দেখলেই সিকিটা—আধুলিটা যাই হোক প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে যান।

আজ দেখলেন বটতলায় বিরাট চেহারার এক প্রাচীন সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। তাঁর বিশাল জটা আর দাড়ি—গোঁফ। মহাদেববাবু চটি ছেড়ে ভক্তিভরে একখানা সিকি প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলেন।

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, কী চাস তুই?

মহাদেববাবু মাথা নেড়ে বললেন, কিছু না বাবা।

সাধুরা সর্বত্যাগী, তাঁদের কাছে কিছু চাইতে মহাদেববাবুর লজ্জা করে।

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, কিছুই চাস না?

না বাবা, আপনার কাছে কেন চাইব? আপনি নিজেই তো সবকিছু ত্যাগ করে এসেছেন।

সাধুর মুখভাব দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। দুই জ্বলজ্বলে চোখে কিছুক্ষণ মহাদেববাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ পাশে রাখা একটা ঝোলা থেকে একটা ছোটো গণেশমূর্তি বের করে বললেন, এটা নিয়ে যা।

মহাদেব মূর্তিটা ভক্তিভরে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। পেতলের তৈরি ছোটো সুন্দর একখানা মূর্তি।

সাধু বললেন, মাথার কাছে রেখে রাতে শুবি।

যে আজ্ঞে। কিন্তু বাবা, আমার তো আর পয়সা নেই, এর দাম দেব কী করে?

কে কার দাম দিতে পারে রে ব্যাটা! দাম দেওয়া কী সোজা! যা, বাড়ি যা।

ভারি যত্ন করে মূর্তিটা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন মহাদেব। তাঁর বিছানার কাছে শিয়রে একটা কুলুঙ্গিতে মূর্তিটা রেখে রাতে শুলেন।

ঘুমিয়ে আছেন, হঠাৎ মাঝরাতে টুক করে কী যেন একটা তাঁর পেটের ওপর পড়ল। তিনি চমকে জেগে উঠে জিনিসটা হাতড়ে নিয়ে আলো জ্বেলে দেখলেন, একটা কাঁচা টাকা। তিনি হাঁ করে চেয়ে রইলেন। টাকাটা কোত্থেকে এল তা আকাশ—পাতাল ভেবেও বুঝতে পারলেন না।

পরদিন কাজে যাওয়ার সময় তিনি বটতলার সাধুটিকে আর দেখতে পেলেন না। শুধু ধুনির ছাই পড়ে আছে। সাধুজী চলে গেছেন। ইচ্ছে ছিল, আজ একটা টাকা প্রণামী দিয়ে যাবেন, তা আর হল না।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রিবেলা ফিরে খেয়ে—দেয়ে ঘুমোলেন মহাদেববাবু। আর কী আশ্চর্য! আজও মধ্যরাতে তাঁর পেটের ওপর আগের রাতের মতোই একটা কাঁচা টাকা কোথা থেকে যেন এসে

পড়ল। ঘুম ভেঙে মহাদেববাবু অবাক হয়ে বসে রইলেন। এটা কী হচ্ছে? এ কী গণেশঠাকুরের মহিমা? তিনি গণেশমূর্তিকে একটা প্রণাম করে বললেন, ঠাকুর, তোমার কত দয়া!

তা রোজই এইভাবে একটা করে টাকা পেতে লাগলেন মহাদেববাবু।

মাসান্তে তাঁর ত্রিশটি টাকা অতিরিক্ত আয় হল। তাতে সংসারেরও সামান্য উন্নতি হল। মহাদেববাবু ত্রিশ টাকা থেকে পাঁচটি টাকা জমিয়ে ফেললেন। টানাটানির সংসারে এতকাল একটি পয়সাও সঞ্চয় হত না।

গণেশবাবার পয়েই যে এ কাণ্ড ঘটছে তাতে তাঁর আর সন্দেহ রইল না। সাধুবাবা তাঁকে কী আশ্চর্য জিনিসই না দিয়ে গেলেন। কৃতজ্ঞতায় রোজ তাঁর চোখে জল আসে।

বছর ঘুরল। ক্রমে ক্রমে মহাদেববাবুর অভাবের সংসারে একটু করেলক্ষ্মীশ্রীও ফিরছে। অল্প অল্প করে টাকাও জমছে। মহাদেববাবু তাতেই খুশি। তাঁর বেশি লোভ নেই।

মহাদেবের এই সামান্য বৈষয়িক উন্নতিও দু—একজনের চোখে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন হলেন, উলটোদিকের বাড়ির মদন চৌধুরী। মদন পয়সাওলা লোক, তবে খুব হিসেবী। সবাই জানে তিনি হাড় কেপ্পন।

একদিন মদনবাবু এসে মহাদেবের সঙ্গে আলাপ জমালেন। নানা কথায় ধীরে ধীরে মহাদেবের বৈষয়িক উন্নতির প্রসঙ্গও এল।

মদন জিজ্ঞেস করলেন, তা মহাদেব, তোমার মহাজন কি তোমার বেতন—টেতন বাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

আজ্ঞে না মদনদা।

তাহলে তোমার মুখখানায় যে আজকাল হাসিখুশি ভাব দেখছি! বউমাও তো তেমন গঞ্জনা দিচ্ছেন না তোমাকে? বলি ব্যাপারখানা কী?

মহাদেব অতি সরল সোজা মানুষ। তিনি অকপটে সরলভাবে গণেশমূর্তির ইতিবৃত্তান্ত সব মদন চৌধুরীকে বলে ফেললেন।

মদন চৌধুরীর চোখ লোভে চকচক করতে লাগল। বললেন, বাপু হে, তুমি তো মস্ত আহাম্মক দেখছি। গণেশবাবার কাছে বেশি করে চেয়ে নাও না কেন? মোটে একখানা করে টাকা— ওতে কী হয়?

মহাদেববাবু মাথা নেড়ে বললেন, না দাদা, উনি খুশি হয়ে দিচ্ছেন, এই ঢের। তার বেশি আমার দরকার নেই।

মদন চৌধুরী খুব চিন্তিত মুখে উঠে চলে গেলেন।

তিন—চার দিন পরে মহাদেববাবু একদিন কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে ফুল—জল দিতে গিয়ে দেখেন, কুলুঙ্গিতে গণেশমূর্তিটি নেই। মহাদেববাবুর মাথায় বজ্রাঘাত। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গণেশমূর্তি পাওয়া গেল না। মহাদেববাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন, তাঁর দু—চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাদেববাবু মনে মনে বললেন, এত সুখ তো আমার কপালে সওয়ার কথা নয়।

ওদিকে মদন চৌধুরীর আহ্লাদ আর ধরে না। মাথার কাছে তাকের ওপর গণেশমূর্তি নিয়ে শুয়ে প্রথম রাত্রেই তিনিও একখানি কাঁচা টাকা পেয়ে গেলেন।

সকালবেলা তিনি গণেশমূর্তিকে প্রণাম করে বললেন, মহাদেবটা আহাম্মক বাবা। ও তোমার মহিমা কী বুঝবে? ও রোজ একটা করে বাতাসা ভোগ দিত, সেইজন্যই তো দুপুরবেলা চুপি চুপি আমি তোমাকে চুরি করে এনেছি। ও বাড়িতে তোমার যত্ন হচ্ছিল না। তোমাকে রোজ আমি সন্দেশ ভোগ দেব। টাকাটা দয়া করে পাঁচগুণ করে দাও।

তাই হল। পরের রাতে পর পর পাঁচটি কাঁচা টাকা এসে পড়ল মদন চৌধুরীর পেটের ওপর। তিনি আহ্লাদে ডগোমগো। গণেশ তাঁর কথা শুনেছেন। সকালবেলায় তিনি গণেশকে প্রণাম করে বললেন, তোমার হাত খুলে গেছে বাবা। তাহলে টাকাটা এবার পঞ্চাশ গুণ হোক।

তাই হল। মাঝরাতে বৃষ্টির মতো তাঁর পেটের ওপর মোট আড়াইশোটা কাঁচা টাকা পড়ল। তাতে মদন চৌধুরীর পেটে বেশ ব্যথাও লাগল। কিন্তু টাকা পেয়ে আহ্লাদে তাঁর ব্যথার কথা মনেই রইল না। সকালে তিনি গণেশবাবাকে প্রণাম করে বললেন, বাবা, দয়াই যদি করলে তাহলে টাকাটা এবার হাজার গুণ করে দাও।

রাত্রিবেলা যা ঘটল তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না মদন চৌধুরী। মধ্যরাতে হঠাৎ যখন তাঁর পেটের ওপর টাকা পড়তে শুরু করল তখন তিনি আহ্লাদে উঠে বসলেন। ওপর থেকে টং টং টং টং করে টাকা পড়তে লাগল মাথায়, গায়ে, হাতে, পায়ে। আড়াই লাখ টাকার বৃষ্টি যখন শেষ হল তখন মদন চৌধুরীর মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে, শরীরের নানা জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। টাকার স্তূপে সম্পূর্ণ ঢাকা।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন শরীরে একশো ফোড়ার ব্যথা। নড়তে পারছেন না। কিন্তু লোভ বলে কথা। ফের গণেশের মূর্তির দিকে চেয়ে বললেন, বাবা, প্রাণ যায় যাক, টাকাটা দু—হাজার গুণ করে দাও।

তারপর দুরু দুরু বক্ষে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ যেন বজ্রনির্ঘোষের একটা শব্দ হল। তারপর বিশাল জলপ্রপাতের মতো টাকা নেমে আসতে লাগল। আহ্লাদে দু—হাত তুলে চেঁচালেন মদন চৌধুরী। কিন্তু আহ্লাদটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। পঞ্চাশ কোটি টাকার বিপুল ভারে তিনি চাপা পড়ে গেলেন। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়ার মতো অবস্থা। ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি।

জ্ঞান ফেরার পর যখন হামাগুড়ি দিয়ে টাকার স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর শরীরে আর শক্তি বলে কিছু নেই। মাথা ঘুরছে, জিব বেরিয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। গণেশবাবার মূর্তির দিকে চেয়ে তিনি হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আর চাই না বাবা, আমার প্রাণটা রক্ষে কর।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! মাঝরাতে ফের টাকার প্রপাত নেমে আসতেই আতঙ্কিত মদন চৌধুরী বিছানা থেকে নেমে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু কাঁচা টাকাগুলো তাঁর মাথায় আর গায়েই এসে পড়তে লাগল। ঘরখানা টাকায় ভরে গেল। আর এই বিপুল টাকার নীচে আবার চাপা পড়লেন মদন চৌধুরী।

পরদিন সকালে কাজে বেরোনোর আগে মহাদেব চাট্টি মুড়ি খাচ্ছিলেন। কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে মদন চৌধুরী এসে তাঁর সামনে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে বললেন ভাই মহাদেব, আমাকে ক্ষমা করো। এই নাও তোমার গণেশ। আমিই চুরি করেছিলুম লোভে পড়ে। তার শাস্তি ভালোমতোই পেয়েছি।

গণেশমূর্তি ফিরে পেয়ে মহাদেবেরও চোখে জল এল।

মদন চৌধুরী চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, বহু টাকা দিয়েছিলেন গণেশবাবা। আজ সকালে কেঁদে—কেটে বললাম, বাবা তোমার টাকা ফেরত নাও। ও আমার চাই না। এ ধর্মের টাকা লোভী লোকের জন্য নয়। তা দয়া করে গণেশ সব টাকা ফেরত দিয়েছেন। আমার ঘরে আর একটিও টাকা নেই। আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

মহাদেব গণেশমূর্তিকে আবার কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলেন। গণেশ যেন হাসতে লাগলেন।

অনুসরণকারী

এই যে অবনীবাবু?

অ্যাঁ! কিছু বলছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বলতেই হচ্ছে মশাই, আপনাকে যত দেখছি ততই হতাশ হচ্ছি।

তাই নাকি? তা আপনি কে বলুন তো! আপনাকে তো চেনা—চেনা মনে হচ্ছে না!

চেনা—চেনা মনে হওয়ার কারণও নেই কিনা। আপনি আমাকে কস্মিনকালেও দেখেননি। এই যে গত দু—ঘণ্টা ধরে আমি আপনার পিছু নিয়েছি সেটা কি আপনি টের পেয়েছেন?

পিছু নিয়েছেন? কী সর্বনাশ? পিছু নিয়েছেন কেন?

সেটা তো ভেঙে বলা যাবে না। বলায় বারণ আছে। শুধু বলছি, আমাকে আপনার পিছু নিতে বলা হয়েছে।

ওরে বাবা! কে বা কারা আপনাকে আমার পিছু নিতে বলল?

সেটাও বলা যাবে না। অনেক প্যাঁচালো ব্যাপার আছে। তবে ব্যাপারটা যে কী তা আমিও ভালো জানি না। পিছু নিতে বলা হয়েছে, আমিও হুকুম তামিল করছি। সঠিক সব খবর জায়গামতো পৌঁছে দিলে কিছু টাকা পাব।

এ তো খুব দুশ্চিন্তার কথা হল মশাই। কেউ টাকা খরচ করে পিছনে স্পাই লাগিয়েছে, এটা তো উদবেগেরই ব্যাপার।

তা হতে পারে। আপনি হয়তো একজন বিপজ্জনক লোক। হয়তো বিদেশি রাষ্ট্রের চর বা উগ্রপন্থী বা চোরাই চালানদার বা খুনি বা জোচ্চোর কিংবা...

মুখ সামলে! মুখ সামলে! এসব কী বলছেন বলুন তো? আপনার নামে তো মানহানির মামলা করা যায়।

আহা, প্রথমেই মামলা—মোকদ্দমা এনে ফেললেন কেন? আপনার সম্পর্কে এখনও তো কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তাহলে ওসব বললেন যে!

বলিনি। সম্ভাবনার কথা বলছিলাম। কিন্তু মশাই, দু—ঘণ্টা ধরে আপনি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন, একবারটিও একটু বেচাল চললেন না! তাহলে পিছু নিয়ে কী লাভ হল বলুন তো?

আচ্ছা মুশকিল! পিছু নিয়ে আপনি কী আশা করেছিলেন বলুন তো?

আশা ভরসা যাই হোক, সে কথা বলে আর লাভ কী? কিন্তু আপনার ভাবগতিক আমার মোটেই ভালো লাগেনি অবনীবাবু।

কেন, কী এমন খারাপ ভাবগতিক দেখলেন?

ধরুন, অফিস থেকে আপনি পাঁচটা নাগাদ বেরোলেন, আর তক্ষুনি আমি আপনার পিছু নিলাম। ঠিক তো?

তা তো ঠিকই। আমার অফিস পাঁচটাতেই ছুটি হয়।

তারপর আপনি অত্যন্ত গদাইলশকরী চালে হাঁটতে—হাঁটতে গিয়ে হেমন্ত কেবিনে ঢুকলেন।

তাও ঠিক।

হেমন্ত কেবিনে ঢুকে আপনি বাঁদিকে একেবারে কোণের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

বহুৎ আচ্ছা। তারপর?

তারপর আপনি দুটো টোস্ট আর এক কাপ কফির অর্ডার দিলেন। ঠিক কিনা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ঠিক।

দেখলাম, আপনি মরিচ টোস্ট খান, চিনি দেওয়া টোস্ট খান না।

ঠিকই দেখেছেন।

এবং টোস্ট আর কফি খেতে খেতে আপনি টেবিলে পড়ে থাকা সকালের খবরের কাগজখানা বেশ অনেকক্ষণ ধরে পড়লেন।

বটেই তো। আপনি বেশ ভালো গোয়েন্দা দেখছি!

তবু তো মশাই, ওপরওয়ালার গাল ওঠে না। সর্বদাই কাজের ভুল ধরেন।

খুব অন্যায়, খুব অন্যায়। হ্যাঁ, তারপর বলুন।

প্রায় আধঘণ্টা পর টোস্ট আর কফি খেয়ে খবরের কাগজ পড়ে আপনি উঠলেন। তারপর হাঁটতে—হাঁটতে হেদো। আচ্ছা মশাই, হেদোর জলে ছেলে—ছোকরাদের দাপাদাপি অত মন দিয়ে দেখার কী আছে বলুন তো! দেখলাম, আপনি খামোখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন। বলছি, হেদোতে কি কারও সঙ্গে আপনার গোপন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল?

তা ছিল বই কী! বিকেলের দিকে আমার বেয়াইমশাইও ওখানে রোজ আসেন কিনা।

বেয়াইমশাই! হাসালেন মশাই। বেয়াইয়ের সঙ্গে কারও অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে বলে শুনিনি। তবে যাই হোক, লোকটা শেষ পর্যন্ত আসেনি। হয়তো কিছু টের পেয়ে সাবধান হয়েছে।

বাঃ, আপনার অনুমান তো দিব্যি ভালো।

আপনি বললে তো হবে না। ওপরওয়ালা যে খুশি হয় না। যাকগে, তারপর মিনিট কুড়ি বাদে আপনি হেদো থেকে বেরিয়ে ফের হাঁটা ধরলেন। বিডন স্ট্রিটের একটা মনোহারি দোকানে ঢুকে নানারকম জিনিসপত্র দেখতে লাগলেন। স্যান্ডউইচ, ব্লেড, টমেটো সস, ধূপকাঠি, কাসুন্দির শিশি, ফিনাইল, যত সব আলতু ফালতু জিনিস।

ওরে বাপ। আপনার চোখ তো সাংঘাতিক!

তবে? ফলো করা কী চাট্টিখানি কথা! চারদিকে চোখ রাখতে হয়। কিন্তু সেই দোকান থেকে আপনি পাঁউরুটি ছাড়া আর কিছুই কিনলেন না। বিবেকানন্দ বেকারির এক পাউন্ডের একটা রুটি, তাই না?

খুব ঠিক।

বিবেকানন্দ বেকারির মিল্ক ব্রেড আমারও বেশ প্রিয়।

তাই নাকি? তাহলে তো আপনার সঙ্গে আমার বেশ মিল!

না মশাই, না। আপনি টার্গেট, আমি আপনার শ্যাডো। সম্পর্কটা খুব বন্ধুত্বের নয়। যাক, রুটি কিনে আপনি আরও খানিকটা হাঁটলেন। হেঁটে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ালেন। একজন বউমতো মহিলা দরজা খুলতেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অভয় বাড়ি আছে? বউটি বলল, না, বার্নপুর গেছে।

তাও শুনেছেন?

হ্যাঁ। বুঝতে পারলাম না, অভয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী? হতে পারে, এই অভয়ই আপনার সহ—ষড়যন্ত্রকারী।

মন্দ বলেননি। কথাটা ভেবে দেখতে হবে। তবে এমনিতে অভয় আমার পুরোনো কলিগ।
তা তো বলবেনই। সত্যি কথা কী এত সহজে বের করা যায়?
সে তো বটেই। কিন্তু সত্যি কথাটা কী তা কি আন্দাজ করেছেন?
তা আর করিনি! গভীর ষড়যন্ত্র মশাই, গভীর ষড়যন্ত্র। অপরাধবিজ্ঞানে বলা আছে, প্রকৃত ভয়ংকর অপরাধীদের বাইরের আচরণ দেখে তাদের মতলব বোঝা অসম্ভব। একজন খুনিকে হয়তো বাইরে থেকে খুবই নিরীহ বলে মনে হয়। আপনাকে দেখেও আমার অনুমান, আপনি অপরাধ জগতের খুব উঁচুদরের খেলোয়াড়। টোস্ট, কফি খাওয়া, সাঁতার দেখা, পাঁউরুটি কেনা বা অভয়ের খোঁজ করা এসবের মধ্যেও একটা গভীর অপরাধপ্রবণ মন নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, ধরা যাচ্ছে না।
চমৎকার! তারপর কী হল?
হ্যাঁ, অভয়কে না পেয়ে আপনি হঠাৎ ডানদিকের একটা গলিতে ঢুকে গেলেন। সেই দুলকি চালে হাঁটা, কোনো উদবেগ বা তাড়াহুড়ো নেই। হাঁটতে—হাঁটতে বড়ো রাস্তায় এসে আপনি একটা বুকস্টলের সামনে দাঁড়ালেন। ঠিক কিনা?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।
বুকস্টলে দাঁড়িয়ে—দাঁড়িয়ে পাঁউরুটিটা বগলে চেপে ধরে পত্রপত্রিকা দেখতে লাগলেন। এইখানে আমার একটু আপত্তি জানিয়ে রাখি। পাঁউরুটি একটা খাবার জিনিস। সেটাকে বগলে চেপে রাখাটা মোটেই উচিত কাজ নয়। মানুষের বগলে ঘাম এবং দুর্গন্ধ থাকেই। পাঁউরুটিটা বগলে চেপে রাখাটা কি আপনার উচিত হয়েছে?
আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কাজটা ঠিক হয়নি। এবার থেকে ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি সজাগ ও সতর্ক থাকব।
হ্যাঁ, আপনি স্টলে দাঁড়িয়ে মোট তিনটে পত্রিকা দেখেছেন। একটা লাইট অফ এশিয়া, একটা ইনলুকার এবং একটা বাংলা পত্রিকা স্বপ্নানন্দা। ঠিক বলেছি?
এ—পর্যন্ত আপনার সব অবজার্ভেশনই নিখুঁত। বলে যান।
ওই বুকস্টলে আপনার সময় লাগল আধঘণ্টা। আপনি বাংলা মাসিকপত্রটা কিনেও ফেললেন। সেটা এখন আপনার হাতেই রয়েছে। অবশ্য জানি না ওই পত্রিকা কেনাটাও কোনো সংকেত কিনা। ওর মধ্যেই হয়তো আপনার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার হালহদিশ রয়েছে।
থাকতেই পারে, থাকতেই পারে। বিচিত্র কী? তারপর?
তারপর থেকে আপনি এসে এই পার্কে বসে আছেন। হয়তো এখানে আপনার সঙ্গে কারও একটা রাঁদেভু হবে। কিন্তু মশাই, সেটা আর কখন হবে? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি না। সন্ধে সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেল যে!
ব্যস্ত হবেন না। কেল্লা তো প্রায় মেরেই দিয়েছেন। ওই যে দেখছেন, মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলা এদিকে আসছেন ওঁর সঙ্গেই আমার রাঁদেভু। উনিই আমার অপারেটর। যত খুনখারাপি, স্মাগলিং আর দুষ্কর্ম আছে সব কাজ উনিই পরিচালনা করেন।
বটে!
হ্যাঁ। তবে বাইরে থেকে দেখে বুঝবেন না। হাতে শাঁখা—পলা, সিঁথিতে সিঁদুর। একেবারে গিন্নিবান্নির মতো চেহারা। কিন্তু ফুলন দেবীর চেয়েও ভয়ংকর।
সর্বনাশ! উনি কে বলুন তো?
উনিই বিদিশা দেবী। আমার স্ত্রী।

গয়ানাথের হাতি

একটা হাতি কেনার ভারি শখ ছিল গয়ানাথের। শখ সেই ছেলেবেলা থেকেই। গাঁয়ের মগনলালের হাতি ছিল। হাতিতে চেপে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত। হাতির ঠমক চমকই আলাদা রকমের। ঘোড়া বা গাধাতেও চাপা যায় বটে, তবে তাতে তেমন সুখ হয় না। কেউ তাকিয়েও দেখে না তেমন। কিন্তু হাতি বেরোলে লোকে ভারি সম্মান করে পথ ছেড়ে দেয়।

তা গয়ানাথ হাতি কিনবে কী, তার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। চাষবাস করে যা মেহনতটা হয় তার দশ ভাগের এক ভাগও ফসল হয়ে ঘরে ওঠে না। ধারকর্জ শোধ করতে করতেই মাঠের ফসল যখন ঘরে পৌঁছোয় তখন তার বারো আনাই খসে গেছে। তবে তা নিয়ে গয়ানাথের দুঃখও নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। গরিবের ঘরে জন্মেছে, গরিবের মতোই বেঁচেই আছে, গরিবের মতোই জীবনটা যাবে। তারা গরিবেরই বংশ। তা বলে হাতির শখ তার যায়নি।

তার যে একটা হাতির শখ আছে সেটা অনেকেই জানে। ধনেশ বৈরাগী একদিন বলল, তা হাতি পুষলে খাওয়াবি কী বাপ? তোর নিজেরই পেট চলে না, আর হাতির পেট দেখেছিস তো, আস্ত একখানা ছোটোখাটো বাড়ি ঢুকে যায়।

গয়ানাথ বলে, তা আর জানি না। হাতির অ আ ক খ সব জানি। খোরাকির চিন্তা পরে, আগে হাতিটা তো হোক।

জপেশ্বর সাধুখাঁ হাটবারে গোরু বেচতে গোহাটায় গিয়েছিল। গয়াকে দেখে বলল, দূর বোকা, হাতি কেনা বেজায় লোকসান। আমার গোরুটা বরং কিনে রাখ, দোবেলা সাত সের দুধ দেবে। হাতির দুধ তো আর মানুষে খেতে পারে না, দোয়ানোও কঠিন কাজ।

গয়ানাথ হেসে বলল, দুধেল হাতি না হলেও চলবে গো জপেশ্বরদাদা।

তবে সবচেয়ে অন্যরকম কথা কয় গয়ানাথের বউ জবা। সে বড়ো ধার্মিক মহিলা। পুজো—আচ্চা, ব্রত—পার্বণ, উপবাস—কাপাস তার লেগেই আছে। সে বলে, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি বাপু, হাতি নিয়ে আমার কাজ নেই। কবে হাতির পায়ের তলায় কার প্রাণ যায় ঠিক কী। হাতির চিন্তা ছেড়ে একটু ভগবানকে ডাকো তো। পরকালের কাজ হোক।

গয়ানাথ অবাক হয়ে বলে, ভগবানকে আবার ডাকাডাকির কী আছে। তাঁর সঙ্গে তো আমার নিত্যি দেখা হয়।

জবা ভয় খেয়ে বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে বলে, ওগো, ভগবানকে নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে নেই। তাতে পাপ হবে যে!

কিন্তু গয়ানাথের মুশকিল হল, কিছুদিন যাবৎ দুপুরবেলায় বাস্তবিকই বটগাছের তলায় ভগবান এসে থানা গেড়ে বসেন। বুড়োসুড়ো মানুষ। একটা চটের থলিতে করে হুঁকো, তামাক, টিকে নিয়ে আসেন। গাছতলায় একখানা আসন পেতে বসে গুড়ুক গুড়ুক তামাক খায়। মাঠে চাষের কাজ করতে করতে আড়ে আড়ে দেখে গয়ানাথ।

একদিন গিয়ে পেন্নাম করে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কে আজ্ঞে, কোথা থেকে আগমন হলেন?

বুড়োমানুষটা ভারি খুশিয়ান হাসি হেসে বলে, আমি হলুম গে ভগবান, বুঝলি! হ্যাতান্যাতা লোক নই, স্বয়ং ভগবান!

বাপ রে! ডবল পেন্নাম হই কর্তা, আপনিই তাহলে তিনি?

তাহলে আর বলছি কী? তা কিছু জাদুটাদু দেখতে চাস নাকি?

জিব কেটে গয়ানাথ বলে, আরে না। আপনার মুখের কথাতেই আমার পেত্যয় হয়েছে।

তা তুই কত বড়ো হাতি চাস বল তো!

গয়ানাথের মুখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বলল, আজ্ঞে হাতিই যদি হয় তাহলে তো বড়ো হওয়াই ভালো, কি বলেন কর্তা?

তা বটে। হাতি ছোটোখাটো হলে আর সুখ কী? হাতি বলে টের পেতে হবে তো!

যে আজ্ঞে। তবে কিনা হাতির বড়ো দাম শুনেছি।

আচ্ছা, তুই মন দিয়ে চাষবাস কর তো। হাতির সময় হোক তখন ঠিক হাতি এসে হাজির হবে।

তা ভগবান প্রায়ই এসে গাছতলায় বসে থাকেন। তার মেহনত দেখেন। তার সুখ—দুঃখের কথাও শোনেন। আর গয়ানাথ মাঝে মাঝে ভগবানের তামাক সেজে দেয়, পা টিপে দেয়, বাতাসও করে।

বউ কথাটা বিশ্বাস করল না দেখে গয়ানাথ মাথা চুলকে বলল, তাই তো! ভগবানকে পেতে হলে অনেক পুণ্যিটুন্যি করতে হয় শুনেছি, তপস্যাও লাগে, কিন্তু আমার তো কিছুই নেই। তাহলে বোধহয় দিনের বেলাতেই আমি জাগাস্বপ্ন দেখি। ভগবান কী আর তুচ্ছ মানুষের কাছে ধরা দেন।

তা সেদিনই ভগবান বললেন, হ্যাঁ রে, তোর আমাকে এত সন্দেহ কেন? জাদুটাদু যদি দেখতে চাস সে অন্য কথা।

আজ্ঞে না কর্তা, বউ বলছিল কিনা, তাই একটু ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম।

বুড়োমানুষ তামাক খেয়ে ভারি আয়েস করে গাছে ঠেস দিয়ে বসে ট্যাঁক থেকে একটা চোপসানো ন্যাতানো বেলুন বের করে বললেন, আজ তোর জন্য একটা হাতি নিয়ে এসেছি।

হাতি! কই হাতি?

এই যে দেখছিস না।

কর্তা, ও তো একটা বেলুন মনে হচ্ছে।

ওরকম মনে হয়, যা দেখছিস সবই তো আদতে বেলুন। এই যে ফুটো দেখছিস এটাতে কষে ফুঁ দে তো বাবা।

তা গয়ানাথ ফুঁ দিল। আর তাজ্জব কাণ্ড। যত ফুঁ দেয় ততই বেলুনটা ফুলে একটা হাতির আকার নিতে থাকে।

ভগবান বলেন, যত বড়ো হাতি চাস তত ফুঁ দিয়ে যা।

বেলুনটা যখন ফুলে বেশ একটা পেল্লায় হাতির সাইজ হল তখন একটা সুতো দিয়ে ফুটোটা বেঁধে দিয়ে বললেন, এই নে তোর হাতি।

হাতিটা দিব্যি দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাতে লাগল, দু—একবার হাতির ডাকও ছাড়ল।

গয়ানাথ তাজ্জব হয়ে বলে, বেলুন থেকে যে হাতি হয় তা আমার জানা ছিল না কর্তা! কিন্তু এই হাতিকে খাওয়াতেও তো হবে!

ভগবান বলেন, তারও ভাবনা নেই। খাওয়ার আগে খানিকটা হাওয়া ছেড়ে দিবি, দেখবি যখন একটা কুকুরছানার মতো ছোটো হয়ে গেছে তখন হাওয়া বন্ধ করে তোর পাতের একমুঠো ভাত দিস, তাতেই দেখবি হেউ—ঢেউ হয়ে যাবে। আর হাতি রাখার জন্য হাতিশালেরও দরকার নেই। বালিশের পাশে ঘুম পাড়িয়ে রাখবি। আর বড়ো হাতিতে তোর বউ ভয় পেলে ছোটো করে নিবি। তখন হাতি তোর ছেলেপুলের সঙ্গে দিব্যি খেলা করতে পারবেখন।

মহা খুশি হয়ে সেদিন বিশাল হাতিতে চেপে বাড়ি ফিরল গয়ানাথ, সারা গাঁ ঝেঁটিয়ে হাতি দেখতে এল। গয়ানাথের বউয়ের গালে হাত। আর তার ছেলেপুলেদের সে কী আনন্দ!

গাঁয়ের মোড়ল—মাতব্বররা তুমুল মিটিং—এ বসে গেল, গয়ানাথের মতো এমন হাড়হাভাতে মানুষ হাতি কিনে ফেলল, এ তো সাংঘাতিক কথা! জিজ্ঞেস করলে সে হাতজোড় করে কেবল বলে, ভগবান দিয়েছেন, নইলে আমার সাধ্যি কী যে হাতি কিনব! কিন্তু মোড়লরা ভগবানের ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাস করল না। বলল, এর মধ্যে একটা প্যাঁচ আছে। গয়ানাথ নিশ্চয়ই গুপ্তধন পেয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যে গাঁয়ে জানাজানি হয়ে গেল যে, গয়ানাথের হাতির সংখ্যা মোটেই একটা নয়। একপাল এবং নানা সাইজের হাতি। সকালে গয়ানাথ তার বিশাল হাতিতে চেপে মাঠে চাষ করতে যায়। দুপুরে তাকে ভাত পৌঁছে দিতে তার বউ যখন যায় তখন যায় একটা ছোটোখাটো হাতিতে চেপে। আবার বিকেলে গয়ানাথের ছেলেপুলেরা যে হাতিটার সঙ্গে খেলা করে সেটা একটা গোরুর সাইজের। আর গাঁয়ের বিখ্যাত চোর নটবর দাস স্বচক্ষে দেখেছে, গয়ানাথের একটা কুকুরছানার মতো ছোটো হাতিও নাকি আছে। আর সেটা গয়ানাথের শিয়রের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমোয়।

মোড়ল—মাতব্বররা তাকে ডেকে বলল, দেখ, গুপ্তধন যদি পেয়েই থাকিস তাহলে তাতে আমাদেরও একটা পাওনা হয়। ভালো চাস তো আধাআধি বখরা করে নে। নইলে ভালো হবে না। যার এবেলা ভাত জুটলে ওবেলা জোটে না তার চার—পাঁচটা হাতি হয় কী করে? গয়ানাথ ফের হাত জোড় করে বলে, সবই ভগবানের ইচ্ছে।

তার বউ জবা একদিন বলল, ওগো, ভগবানের সঙ্গে যখন তোমার এতই ভাব তখন আর একটু চেয়েই দ্যাখো না! আমাদের তো এত অভাব। শুধু হাতি হলেই তো হবে না।

তা কী চাইব?

এই একখানা সাতমহলা বাড়ি, সাত ঘড়া মোহর, সাত কলসি হিরে—মুক্তো।

তা সে আর বেশি কথা কী? বলবখন।

সেদিন ভগবান গাছতলায় বসেছেন। গয়ানাথ তাঁকে পাখার হাওয়া করতে করতে বলল, আজ্ঞে বাবা, একটা কথা ছিল।

ভগবান হুঁকোয় টান দেওয়া থামিয়ে বললেন, সাতমহলা বাড়ি, সাত ঘড়া মোহর আর সাত কলসি হিরে—মুক্তো তো! তাতে হবে তো তোর? আরও কিছু লাগবে না?

মাথা চুলকে গয়ানাথ বলে, বউ তো আর কিছু বলেনি।

ভগবান মিটিমিটি হেসে বলেন, সাতমহলার জায়গায় চৌদ্দ মহলা বাড়ি হলে তো আরও ভালো, চৌদ্দর জায়গায় চৌষট্টি মহল হলে আরও আনন্দ— কী বলিস? আর সাত ঘড়াই বা কেন, ভগবান তো তোকে সাত হাজার ঘড়া মোহর দিতে পারে, আর হিরে—মুক্তোও সেই পরিমাণ।

গয়ানাথ শুকনো মুখে বলে, আমি গরিব মানুষ, অত কী সামলাতে পারব?

আহা, সামলানোর জন্য মাইনে দিয়ে লোক রাখবি। তখন কী আর তুই আজকের গয়ানাথ থাকবি? কেষ্ট বিষ্টু হয়ে উঠবি যে, সমাজ তোকে দু—বেলা সেলাম ঠুকবে। ভালো হবে না?

গয়ানাথ খুব চিন্তিত মুখে বলে, শুনে ভালো লাগছে না বাবা।

তাহলে ভালো করে ভেবে দ্যাখ গিয়ে। বউয়ের সঙ্গেও পরামর্শ করিস। যা চাস তাই পাবি। তবে—

তবে কী বাবা?

এই গাছতলায় রোজ দুপুরে যে এসে বসতুম সেটা আর হবে না। তোকে দিয়ে থুয়ে, একটা হিল্লে করে দিয়ে আমাকে এবার পাততাড়ি গুটোতে হবে।

শুনে গয়ানাথের বুকটা কেমন করে উঠল। বলল, বাবা, তুমি না এলে যে চারদিক বড়ো ফাঁকা হয়ে যাবে।

দুর বোকা! আমি না এলেই কী! তোর কত লোকলশকর হবে, কত নামডাক হবে। কত খাতির হবে তোর!

রাত্রিবেলা বউয়ের কাছে সবটাই খুলে বলল গয়ানাথ। জবা বলল, আহা, ভগবানবাবা এসে গাছতলায় না—ই বা বসলেন। আমি তাঁর জন্য সোনার সিংহাসন বানিয়ে দেব। রোজ পোলাও পায়েস ভোগ দেব, ঠাকুরের সোনার গড়গড়া হবে, তুমি বরং ওটাই চেয়ে নাও। আর রোদে জলে ভগবানের গাছতলায় বসে কষ্ট করার দরকারই বা কী!

কথাটা কানে যেন ভালো শোনাল না গয়ানাথের। তার বেশি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। ভালো—মন্দ বিচার করার ক্ষমতাও কম। সে শুধু বোঝে, বুড়োমানুষটা এসে ওই যে গাছতলায় বসে থাকেন ওতেই তার বুক ভরে যায়।

পরদিন হাতির হাওয়া খুলে দিয়ে বেলুনটাকে ট্যাঁকে গুঁজে মাঠে গেল গয়ানাথ। তারপর দুপুরে ভগবান এসে গাছতলায় বসতেই তাড়াতাড়ি গিয়ে তামাক সেজে হাতে হুঁকোটা ধরিয়ে দিয়ে একটা প্রণাম করে উঠল। ট্যাঁক থেকে ন্যাতানো বেলুনটা বের করে বলল, এই নাও বাবা, তোমার জিনিস, আমার হাতির শখ মিটে গেছে।

বলিস কী?

আজ্ঞে, দুনিয়ার সব জিনিসই যে ফোলানো জিনিস, ফোঁপড়া, তা আমি টের পেয়েছি।

তা কী ঠিক করলি?

ওসব মোহর টোহরে আমার দরকার নেই। আধপেটা খেয়ে থাকব, তবু রোজ তোমাকে গাছতলায় এসে বসে থাকতে হবে।

ভালো করে ভেবে দ্যাখ।

ভাবতে আমার বয়েই গেছে। অত বুদ্ধিও নেই। আমার ভাবনা তুমিই ভাবো।

ভগবান গুড়ুক গুড়ুক তামাক খেতে খেতে খুব হাসলেন। যেন কথাটা শুনে ভারি আহ্লাদ হয়েছে তার।
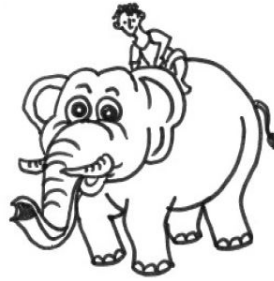
রুণু

লালটু বৈরাগী ছিল জমিদারের মাহুত। বেশি বয়স নয় তার। বাইশ—তেইশ হবে, আর যে হাতিটায় সে মাহুত হয়ে চাপত সেটা ছিল বিশাল আকারের। রাস্তা দিয়ে যখন চলত মনে হত একটা পাহাড় হেঁটে যাচ্ছে।

বারবাড়ির মাঠে আমরা খেলতাম, খেলুড়িদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু ছিল রুণু নামের একটা ছেলে, তার মতো বাঁদর ছেলে কমই হয়। ছ্যাকরাগাড়ির ঘোড়াগুলিকে গাড়োয়ানরা ওই মাঠে ছেড়ে দিয়ে যেত ঘাস খাওয়ার জন্য। রুণু নারকেলের দড়ি দিয়ে লাগাম বানিয়ে সেই ঘোড়াগুলোর পিঠে চড়ে উত্যক্ত করে মারত। তার পকেটে সবসময়ে থাকত গুলতি। কাকে যে টিপ করবে তার ঠিক নেই, ফকেরুদ্দিনকে এমন গুলতি মেরেছিল যে দম বন্ধ হয়ে সে চোখ উলটে ফেলেছিল। যার ওপর রাগ হত তাকে বিচুটি গাছ তুলে এনে তাড়া করত। স্কুলের ক্লাসে, পাড়ায় এবং বেপাড়ায় মারপিট লেগেই থাকত তার। প্রতিদিন তার শরীরে নতুন নতুন কাটা বা ফোলা বা কালশিটের দেখা পাওয়া যেত। যেমন মারত তেমনি মার খেতও প্রচুর।

সেই রুণু একদিন দৌড়ে গিয়ে জমিদারের হাতির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। লালটু রাগ করে বলল, তোর আক্কেল নেই! হাতির পায়ের তলায় গেলে কী হত জানিস?

তা তুমি আছ কী করতে? হাতি সামলাতে পারো না?

না পারলে এতক্ষণে কী হত জানিস?

খুব জানি। একটু হাতিতে চড়াও না লালটুদা।

সে উপায় নেই। এখন যাচ্ছি হাতি চান করাতে, দেরি হয়ে গেলে মুশকিল।

একটু চড়াও না লালটুদাদা, ও লালটুদাদা গো, পায়ে পড়ি।

উরেব্বাস রে! বামুনের ছেলে হয়ে ওকথা বলতে আছে?

আমার যে পাপ হবে রে! আচ্ছা, হাতিতে বসাচ্ছি, সাবধানে চড়বি।
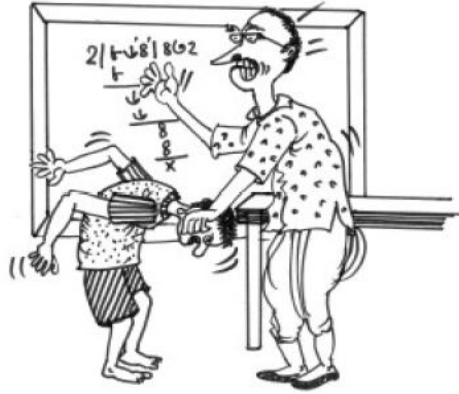
হাওদা নেই, বস্তা—টস্তা বাঁধা নেই, হাতির খোলা পিঠে চড়া কিন্তু ভারি শক্ত ব্যাপার, কারণ হাতির বেজায় চওড়া পিঠে দু—ধারে পা ঝুলিয়ে বসবার উপায় নেই, হাওদা না থাকায় ধরার মতোও কিছু থাকে না বলে সবসময়েই পড়ে যাওয়ার ভয়, কারণ হাতি চলে হেলে—দুলে, আর একটা অসুবিধে হল হাতির গায়ের লোম, যেগুলো ছুঁচের মতো গায়ে বেঁধে।

কিন্তু হাতি চড়ার আনন্দে ওসব অসুবিধে আর কী গায়ে মাখে। হাতি বসতেই হইচই করে ছেলেপুলেরা হাঁচড়ে—মাচড়ে উঠে পড়ল তার পিঠে, হাতি উঠে দাঁড়ানোর সময় সে যেন ভূমিকম্পের অবস্থা, সওয়ারিরা পড়ে যায় আর কী, উপুড় হয়ে হাতির লোম খামচে ধরে কোনোরকমে সামাল দেওয়া।

হেলেদুলে যখন হাতি চলছে তখন মনে হচ্ছে আমাদের চারদিকটাই দোল খাচ্ছে, সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।

পড়া পারত না বলে স্কুলে প্রথম পিরিয়ড থেকেই রুণুকে নানারকম শাস্তি পেতে দেখতুম, হয় বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো ক্লাসের বাইরে নীলডাউন, আর নাহলে নানুবাবুর ক্লাসে হাত পেতে বেত খাচ্ছে। কিন্তু ওসব ছিল তার গা—সওয়া। একবার ক্লাসে মারপিট করায় মনিটর তার নাম লিখেছিল লিস্টিতে। প্রাণেশবাবু ক্লাসে এসেই তার চুল ধরে মাথাটা নামিয়ে পিঠে বিরাশি সিক্কার এক থাপ্পড় মারলেন। সেই শব্দে ক্লাস কেঁপে উঠল। রুণু নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে কানে আঙুল দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে বলল, মেরে ভালোই করলেন স্যার। সকালে নদীতে চান করতে গিয়ে কানে জল ঢুকে গিয়েছিল, থাপ্পড়ের চোটে সেটা বেরিয়ে গেছে, আর যাবে কোথায়, এই কথা শুনে প্রাণেশবাবুর সে কী মার রুণুকে!

হ্যাঁ, ওই সাঁতার, স্কুলে যাওয়ার অনেক আগেই রুণু গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে নেমে পড়ত। জলের নেশা ছিল তার, অন্তত দু—ঘণ্টা ধরে সে সাঁতরাত। ডুবত, উঠত, চিৎসাঁতার, ডুবসাঁতার সবকিছুতেই ওস্তাদ ছিল সে, অতক্ষণ জলে থাকায় গা সাদা হয়ে যেত তার। তারপর দাদু বা দাদা কেউ এসে তাকে হাত ধরে টেনে তুলে বাড়ি নিয়ে যেত।

তাকে যিনি পড়াতে আসতেন সেই নীতিন মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে বলতেন, তোমার মাথা তো খারাপ নয়, তবে পরীক্ষায় কম নম্বর পাও কেন?

আমার বেশি লিখতে ভালো লাগে না।

বেশি লেখার তো দরকার নেই, কারেকট লিখলেই হল।

আমার ভালো ছেলে হতে ইচ্ছে করে না।

কী মুশকিল! তুমি কি ইচ্ছে করে ভুল লিখে দিয়ে আসো?

রুণু চুপ।

নিরীহ নীতিনবাবু বলেন, আমার কাছে যখন পড়া দিচ্ছ তখন ভুল হচ্ছে না, কিন্তু ইস্কুলে গেলেই ভুল! এরকম তো হওয়ার কথা নয়।

মা সব শুনে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, তুই এমন কেন করিস বাবা? তোকে লোকে ভুল বুঝলে যে আমার বড়ো কষ্ট হয়।

রুণু মাকে জড়িয়ে ধরে গায়ে মুখ গুঁজে বলে, আমি তো খারাপ ছেলে মা!

শোনো কথা! কে তোকে খারাপ বলে রে? দুষ্টু? সে তো অনেকেই ছেলেবেলায় দুষ্টু থাকে। দুষ্টু তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

সেবারে রুণু পরীক্ষায় ফার্স্ট হল না বটে, কিন্তু সেকেন্ড হল। স্কুলের সবাই অবাক, যে ছেলে সারা বছর পড়া পারে না, সে কী করে এক ঝটকায় এত নম্বর তুলে ফেলল!

নাগমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই টুকেছে।

হেডস্যার এমদাদ আলি বিশ্বাস রাশভারি মানুষ। মাথা নেড়ে বললেন, টুকলে পাশ নম্বর হয়তো ওঠে, কিন্তু স্ট্যান্ড করা যায় না। কারণ টোকা দেখে কপি করতে অনেক সময় লাগে, টুকলিবাজরা কখনো ফার্স্ট—সেকেন্ড হয় না।

রুণুর একটু গুণও ছিল। সে কখনো কোনো ফড়িং—এর ডানা ছিঁড়ে দেয়নি, পাখি বা কুকুরকে ঢিল মারেনি, কানা—খোঁড়া কাউকে কখনো খ্যাপায়নি, সে কুকুর পোষে, তার একটা ডানা—কাটা বুলবুলি পাখি আছে। পাখিটাকে কেউ ডানা কেটে ছেড়ে দিয়েছিল, উড়তে পারছিল না। তাকে যত্ন করে সে খাঁচায় রেখেছে। আকাশের দিকে তাকালে তার মন খারাপ হয়ে যায়। সে জেনেছে আকাশের নীল ছাদটা আসলে কোনো ছাদ নয়, আসলে আকাশের কোনো সীমানা নেই। এতবড়ো এত বিশাল যে ভাবতে গেলেই তার মাথা ঝিমঝিম করে, মনে হয়, বিশ্বজগৎটা একটু ছোটো হলে বড়ো ভালো হত। কেন যে হল না!

নদী আর দাদু, রুণুর সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি হল দাদু। দাদুর কাছে রোজ রুণুর নামে কত নালিশ জমা হত। কার আম, কার জাম, কার লিচু বা পেয়ারা পেড়ে এনেছে। কার টিনের চালে ঢিল মেরেছে, কার ছেলেকে ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়ে এসেছে, দাদু গম্ভীর হয়ে শোনেন আর বলেন 'হুঁ'। ওই 'হুঁ—তেই সব শাসন থেমে থাকে। সেই আততায়ী নাতিকে নিয়েই দুপুরে এক পাতে খেতে বসেন তিনি। পরম স্নেহে নিজে হাত গুটিয়ে নাতিকে ইচ্ছেমতো পাত লণ্ডভণ্ড করতে দেন।

আর বহমান ওই নদী। নদীর কোনো নীরবতা নেই। চির প্রগলভ নদীর ভাষা বুঝবার কত চেষ্টা করেছে সে, পারেনি। কিন্তু তবু কখনো—সখনো খেলা ফেলে, দুষ্টুমি ভুলে, খিদে চেপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদাস হয়ে বসে থেকেছে নদীর ধারে। যদি নদীর কথা বোঝা যায়। কত দূর থেকে কত গল্প বয়ে আনে নদী, কত শহরের প্রতিবিম্ব তার বুকে লুকিয়ে থাকে, কত মানুষের স্পর্শ।

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে রেলগাড়িতে চেপে একবার কোথাও যাচ্ছে রুণু। তখন ছোটো, তার মন ভালো করার জন্য জ্যাঠামশাই একটা রসগোল্লা কিনে দিয়েছেন তার হাতে। রসগোল্লার মতো কিছুই হয় না। পেটুক রুণু হাঁ করে সবে কামড় বসাতে যাবে, ঠিক সেইসময়ে আকাশ থেকে লটপট করতে করতে একটা মস্ত চিল এক ঝটকা মেরে রসগোল্লাটা কেড়ে নিয়ে গেল। আর তার ধারালো নখের আঁচড়ে ডান হাতের একটা আঙুল কেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল। জ্যাঠামশাই অপ্রস্তুত, রুমাল বেঁধে হাতের রক্ত সামাল দিচ্ছেন।

রুণু কাঁদেনি, খুব অবাক হয়েছিল। চিলের দুষ্টুমির কথা সে জানে, আগেও কতবার দোকান থেকে কচুরি বা জিলিপি আনার সময় চ্যাঙারি কেড়ে নিয়ে গেছে। নতুন তো নয়, কিন্তু এই যে রসগোল্লাটা হাতে এই ছিল— এই নেই হয়ে গেল। এই বিস্ময়টাই তার যেতে চায় না। ডান হাতের সেই হঠাৎ শূন্যতা সে অনেকদিন ধরে টের পেত।

কেনারাম

গিরিজাবাবু নাকি?

যে আজ্ঞে। আমি গিরিজা পুততুণ্ডই বটে। তা আপনি? আমাকে চিনবেন না। আমার নাম করালী ঘোষ। ভীমপুরে সাত পুরুষের বাস।

অ, তা ভালো কথা। এখানে কী কাজে আগমন?

কাজে তেমন কিছু নয়। গোরু খুঁজতে বেরিয়েছি।

গোরু খুঁজতে এত দূর! ভীমপুর তো না হোক চোদ্দো—পনেরো মাইল দূর হবে। বাড়ির আশেপাশেই খুঁজে দেখুন, হারানো গোরু পেয়ে যাবেন।

গোরু হারালে তো হারানো গোরুর কথা ওঠে মশাই। আমার যে গোরু হারায়নি।

তা হলে যে বললেন, গোরু খুঁজতে বেরিয়েছেন।

তা অবশ্যি ঠিক। গোরু খুঁজতে বেরোনো বটে। তবে কিনা সেটা হারানো গোরু নয়।

তবে কি গোরু কিনতে বেরিয়েছেন নাকি?

আজ্ঞে না। আমাদের গোয়ালে বারোটা গোরু। গোশালায় আর তেমন জায়গাও নেই কিনা। গোরু গোঁজা খোঁজা আমার একটা নেশা বলতে পারেন।

গোরু খোঁজার নেশা। এরকম তো কখনো শুনিনি মশাই। ওরকম নেশা আবার হয় নাকি?

ঠিকই বলেছেন। গোরু খোঁজার অভ্যাসকে ঠিক নেশাও বলা যায় না বটে।

ভালো কথা, আপনি দেখছি আমার নাম জানেন। কিন্তু আমি তো তেমন কেষ্টুবিষ্টু মানুষ নই! নামটা জানলেন কী করে?

ওই পুবের মাঠে একটা বেশ নধরকান্তি সাদা রঙের গোরু দেখে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, গোরুটা কার।

তা একজন নস্করবাবু বললেন, গোরুটা গিরিজাবাবুর। সঙ্গে এও বললেন, চামার মশাই, চামার। আটটা গোরু দু—বেলা না হোক বিশ কিলো দুধ দিচ্ছে, তবু পঁচিশ টাকার এক পয়সা কমে দুধ বিক্রি করবে না।

বটে! নস্করের এতবড়ো সাহস!

চেনেন নাকি নস্করবাবুকে?

কে না চেনে নচ্ছারটাকে? মোটে আধসের করে দুধ নিত, তাও তিন মাসের টাকা বাকি। ছ—মাস ঘুরে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তবে চার কিস্তিতে টাকা আদায় করা গেছে। ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

তা হতে পারে। তবে কিনা নস্করবাবু আমাকে বিশুর চায়ের দোকানে এক ভাঁড় চা খাইয়েছেন। সঙ্গে দুটো কুকিস বিস্কুট।

তাতে কী মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? চা আর বিস্কুটেই কাত হয়ে পড়বেন না যেন। কেনারাম নস্কর অতি ধুরন্ধর লোক। মতলবের বাইরে এক পয়সা খরচ করার পাত্র নয়। সেবার পাত্রপক্ষ ওর মেয়েকে দেখতে এসে ট্যারা বলেছিল বলে মিষ্টির প্লেট তুলে নিয়ে গিয়েছিল সামনে থেকে।

এঃ, এ তো মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া। নাঃ, এ কাজটা কেনারাম নস্কর মোটেই ভালো করেননি। তা কেনারামবাবুর মেয়ে সত্যিই ট্যারা নাকি?

ট্যারা বলতে ট্যারা! বেজায় ট্যারা মশাই। তার ওপর বেঁটে, কালো, দাঁত উঁচু। ওই কেনারামের মতোই চেহারা!

বলেন কী মশাই! তা হলে কী আমি দিনে—দুপুরে ভুল দেখলুম! কেনারাম নস্করকে তো আমার দিব্যি ফরসা বলেই মনে হল! আর বেঁটে তো নন। দিব্যি লম্বা চেহারা! ট্যারা কিনা সেটা অবিশ্যি ভালো করে লক্ষ করেনি। নয় বলেই যেন মনে হচ্ছে।

তা সে যাই হোক, কেনারাম মানুষ মোটেই ভালো নয়। ওর সঙ্গে আপনি মোটেই মেলামেশা করতে যাবেন না যেন! এই গাঁয়ে তো একঘরে।

গোরু খুঁজতে বেরিয়ে কী মুশকিলে পড়া গেল মশাই।

কেন, মুশকিলটা কীসের?

প্রথম মুশকিল হল, মানুষের খিদে—তেষ্টা বলে একটা ব্যাপার আছে। তারপর ধরুন, পেটপুরে খেলে দুপুরে আমার বড্ড ঘুম পায়, তার ওপর নরম বিছানা না হলে আমার মোটে ঘুমই আসে না। তা কেনারামবাবু পই—পই করে বলে দিয়েছেন আজ মধ্যাহ্নভোজনটা যেন আমি তাঁর বাড়িতেই সারি। কিন্তু আপনার কথা শুনে তো বড়ো দমে গেলুম মশাই। কেনারাম নস্কর যে এত খারাপ লোক তা জানা ছিল না আমার। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজটা কী তা হলে আজ উহ্য রাখতে হবে!

গিরিজাবাবু ফুঁসে উঠে বললেন, তার মানে! উহ্য রাখলেই হল? গাঁয়ের একটা মান— ইজ্জত নেই? বলি কেনারাম কী—ই বা খাওয়াত আপনাকে শুনি? মোটা চালের ভাত, পাতলা জলের মতো ডাল, পুঁটি মাছের ঝোল আর বড়োজোর একটুকরো লেবু।

এত খারাপ?

তবে আর বলছি কী। চলুন, আমার বাড়িতে চলুন। সরু চালের ভাত, গাওয়া ঘি, বেগুন ভাজা, সোনা মুগের ডাল, মাছের মুড়ো, পাঁঠার মাংস, একবাটি পায়েস, চলবে তো?

কষ্টেসৃষ্টে চলে যাবে। তবে কিনা ডালের পাতে একটু ভাজাভুজি না হলে আমার চলে না।

খুব—খুব। গাছে বকফুল—কুমড়ো ফুল আছে। তাই দিয়ে বড়া। তারপর পটল আছে, কুমড়ো আছে, আর চাই কী আপনার? আসুন তো মশাই। লজ্জা করবেন না।

আহা, এত উতলা হবেন না। বেলাও বেশি হয়নি। মাত্র পৌনে বারোটা বাজে। মহাজনেরা কী বলেছেন জানেন তো! ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।

আহা, কান জুড়িয়ে গেল। মহাপুরুষরা যে কত ভালো ভালো কথা বলেন তার হিসেব নেই। তা করালীবাবু, কথাটা উঠল কেন?

না, ভাবছিলাম কেনারাম নস্করের মতো একজন কেষ্টবিষ্টু মানুষকে চটানোটা উচিত হবে কিনা।

কেষ্টবিষ্টু! কেনারাম আবার কেষ্টবিষ্টু হল কবে?

এই যে কানাঘুষো শুনলুম তাঁর নাকি তিনতলা বাড়ি, বিরাট আমবাগান, তিনশো নারকেল গাছ, দুশো বিঘে ধানী জমি আর হিমঘর আছে।

ফোঁপরা মশাই ফোঁপরা। বেলুন দ্যাখেননি? লাল—নীল—সবুজ, দিব্যি নিটোল আকৃতি। হাওয়া বের করে দিলেই একটুখানি। কেনারামও তাই। ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন গে, সব মর্টগেজে বাঁধা আছে।

আপনি তো মুশকিলে ফেলে দিলেন মশাই। কেনারামবাবুর ছেলে সাতকড়ির সঙ্গে যে আমার মেয়ের বিয়েরও একটা প্রস্তাব আজ সকালে দিয়ে বসলেন উনি!

বলেন কী? ওই গিদধরের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন? মাথা খারাপ হল নাকি আপনার? তার চেয়ে হাত—পা বেঁধে মেয়েকে জলে ফেলে দিন তাও ভালো।

তবে তো চিন্তার কথা হল মশাই!

তা তো বটেই। ভালো করে চিন্তা করুন। তবে বলে রাখি, মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে আমারও উপযুক্ত পুত্র আছে। বিএ পাশ, স্কুলের মাস্টার, দিব্যি কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারা।

সে তো বুঝলুম। কিন্তু আরও একটু কথা আছে।

কী বলুন তো।

কেনারামবাবু বললেন, এক পয়সা পণ নেবেন না, দানসামগ্রী দিতে হবে না, শুধু শাঁখা—সিঁদুর দিয়ে বিয়ে দিলেই চলবে। শুনে তো আমার চোখে জল এল। এই কলিযুগেও এমন মানুষ আছে।

আছে মশাই আছে। কুমিরের চোখের জলকে বিশ্বাস করবেন না। কেনারাম নিশ্চয়ই অন্য মতলব এঁটে রেখেছে। আর পণের কথা বলছেন? পণকে তো আমি গো—মাংস বলে মনে করি। আর দানসামগ্রী! ছিঃ, ওসব কী ভদ্রলোকেরা নেয়?

গিরিজাবাবু আপনি আমাকে ছলনা করছেন না তো!

আরে না মশাই, না। কথা একেবারে পাকা। নড়চড় নেই। শুধু ওই কেনারামটার সঙ্গে মেলামশো করবেন না যেন।

আজ্ঞে, সে আর বলতে! চলুন মধ্যাহ্নভোজটা সেরেই ফেলি। বেলা অনেক হয়েছে।

পরাণের ঘোড়া

ঘোড়ার মতো জিনিস হয় না। দেখতে যেমন বাহারের, ক্ষ্যামতাও তেমনি দশ মুখে বলার মতো। পরাণ সেই ছেলেবেলা থেকে ঘোড়া দেখে আসছে। তার বাবা গড়ান মণ্ডল ছিল শশীবাবুর আস্তাবলের ছোটো সহিস। মস্ত জমিদার শশীবাবুর ভারি ঘোড়ার শখ। মেলা টাকা খরচ করে দিগ—বিদিগ থেকে ঘোড়া কিনে আনতেন। মোট এগারোখানা ঘোড়া ছিল তাঁর। দুঃখের বিষয় মোটা মানুষ বলে শশীবাবু ঘোড়ায় চাপতে পারতেন না। তাঁর ছিল দেখেই সুখ। পরাণেরও তাই। মাঝে মাঝে বাবার কাছে ঘোড়ায় চাপবার আবদার করত ঠিকই, কিন্তু বাপ গড়ান ভয় খেয়ে বলত, পাগল হয়েছিস! শশীবাবুর ঘোড়ার পিঠে তোকে চাপালে রক্ষে আছে? তদ্দণ্ডে আমার চাকরিটা যাবে।

সেই ইচ্ছে মনে মনে পুষে রেখেই বড়ো হল পরাণ। আর বড়ো হয়ে সেও তার বাপের মতোই গরিব হল। পয়সা মোটেই হচ্ছিল না তার। তবে ঠিক করে রেখেছিল, পয়সা যদি কোনোদিন হয় তবে আর কিছু নয়, নিজের জন্য একটা ঘোড়া কিনবে।

তা ঘোড়া হল না পরাণের। গন্ধেশ্বর দাসের খেতে মজুর খেটে দিন গুজরান হয় তার। অসুরের মতো খাটুনি বটে, তবে পরাণ বিয়ে—থাওয়া করেনি বলে চলে যায়। এখন তার বাতিক হয়েছে ছুটি হলেই কাগজ—কলম—পেনসিল বা সস্তায় কেনা রঙের কাঠি দিয়ে ঘোড়ার ছবি আঁকা। আঁকা শেখেনি কারও কাছে। কিন্তু তাতে কী, কাউকে দেখানোর জন্য তো নয়, নিজের জন্যই সে অখণ্ড মন দিয়ে নানা ধরনের ভঙ্গিতে ঘোড়ার ছবি আঁকার চেষ্টা করে যায়। ওইটেই তার নেশা। ফুলবাড়ির হাটে একটা লোক মাঝে মাঝে পটের ছবি বিক্রি করতে আসে। তার কাছে রঙ—তুলিও পাওয়া যায়। আর ছবি আঁকার ভুষো কাগজও। পয়সা খরচ করে সেই রঙ কিনে আনল একদিন। দেখল তুলি দিয়ে আঁকার আরও সুবিধে। প্রথমটায় মাপটাতে একটু অসুবিধে হয় বটে, তবে কিছুদিনের চেষ্টায় দেখল ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়। সারাদিন খেতের কাজ করে সন্ধেবেলা এসে পরাণ ছবি আঁকতে বসে যায়। নিজে আঁকে, নিজেই দেখে। তারপর একটু—আধটু শুধরোতেও হয়।

ফুলবাড়ির হাটের পটুয়া হরিরাম তার ছবি আঁকার শখ দেখে বলল, চট বা ক্যানভাসে আঁকলে তা বহুদিন টিকবে, বলে কয়েকখানা ছবি আঁকার ছোটো ক্যানভাস তাকে বেজায় সস্তাতেই দিয়ে দিল।

এদিকে গন্ধেশ্বর একদিন তাকে ডেকে বলল, দ্যাখ বাপু, তুই বেশ গায়ে—গতরে আছিস। আমি কেরামতের বাঁধের ধারের জমিটা রেজিস্ট্রি করতে গঞ্জে যাচ্ছি। সঙ্গে টাকা থাকবে। চলনদার হিসেবে তুই

সঙ্গে যাবি। দিনকাল ভালো নয়।

রাজি না হয়ে উপায় কী? একখানা মজবুত লাঠি কাঁধে নিয়ে গন্ধেশ্বরকে পাহারা দিয়ে গঞ্জে নিয়ে যাচ্ছিল পরাণ, পীরপুর শ্মশানের ধারে যখন গোরুর গাড়ি পৌঁছেছে তখনই আশপাশের বাঁশঝাড় থেকে জনা পাঁচ—সাত লেঠেল ডাকাত বেরিয়ে এসে চড়াও হল।

পরাণ গায়ে—গতরে লম্বায়—চওড়ায় বেশ জোয়ান বটে তবে তেমন বীর নয়। জীবনে মারপিট করেনি। আদতে সে নিরীহ মানুষ। তাই ডাকাতদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্যই তার ছিল না। তবে আর কিছু না পারুক গন্ধেশ্বরকে সে আগলে রেখেছিল। বলেও ছিল, টাকার বটুয়াটা ছেড়ে দেন কর্তা। টাকা তো আর প্রাণের চেয়ে বড়ো নয়। কিন্তু গন্ধেশ্বরের কাছে তা নয়, টাকাই তার জানপ্রাণ। ফলে ধুমধাড়াক্কা লাঠিপেটা খেতে হল তাকে। গন্ধেশ্বরের চেয়েও পিটুনি অনেক বেশি খেতে হল পরাণকে। কাঁকালে চোট, মাথায় চোট, কনুইয়ের চোট।

কয়েক লহমায় লুটপাট সেরে ডাকাতরা হাওয়া হওয়ার পর গাঁয়ের লোক এসে তাদের জল—টল দেয়, নিয়ে গিয়ে দাওয়াতে বসায়। টাকার শোকে খুব কান্নাকাটি জুড়েছিল গন্ধেশ্বর। তারা নানা সান্ত্বনাবাক্যে তাকে ঠান্ডা করল। বাড়ি ফিরে গায়ের ব্যথা আর টাকার শোকে শয্যা নিল গন্ধেশ্বর। আর পরাণ রাত্তিরবেলাতেই তার লণ্ঠন জ্বেলে বসে গেল ছবি আঁকতে। তবে ঘোড়ার নয়, আজ যারা হামলা করেছিল তাদের মধ্যে দু—জনের মুখ তার মনে গেঁথে আছে। ছবিতে মুখ দুটো ফোটানো যায় কিনা সেটাই দেখছিল পরাণ, এবং দেখল, ছবি দুটো প্রায় হুবহু হয়েছে।

ডাকসাইটে দারোগা অনাদি সরখেল ডাকাতির তদন্তে এসে গন্ধেশ্বর আর পরাণকে মেলা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। চেহারার বর্ণনা চাওয়াতে পরাণ তার আঁকা ছবি দুটো এনে দেখাতেই দারোগাবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, এ তো ধামাল আর ধানুকা! বিস্তর কেস আছে এদের নামে!

তিন দিনের মাথায় ডাকাতদের পাঁচ—সাতজন ধরা পড়লে গন্ধেশ্বরের তিন লাখ টাকার দু—লাখ উদ্ধারও হয়ে গেল। অনাদি সরখেল কঠিন মানুষ হলেও রসকষহীন নন। তিনি পরাণকে একদিন থানায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুই কি ছবি আঁকিস নাকি?

পরাণ ছবি আঁকাটা অপরাধ কিনা বুঝতে না পেরে খুব ভয়ে ভয়ে বলল, ওই একটু—আধটু মকসো করি আর কী। মাপ করে দেন গুজুর।

অনাদি গম্ভীর গলায় বললেন, মাপ করার কিছু নেই। ছবি আঁকা খারাপ কাজ তো নয় রে আহাম্মক। তোর আঁকার হাত তো দিব্যি ভালো। কার কাছে শিখিস?

পরাণ হাত কচলে বলে, গরিব মানুষ হুজুর, কার কাছে শিখব? নিজেই একটু—আধটু চেষ্টা করি।

হবিবপুরে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করিস। সমঝদার মানুষ। আমি বলে রাখবখন।

সুধীরবাবু তাঁর আঁকা দেখে ভারি অবাক হয়ে বললেন, না শিখেই যা এঁকেছিস তাইতেই তো তাজ্জব হতে হয়। তা শুধু ঘোড়ার ছবি কেন রে? আর কিছু আঁকিস না?

আজ্ঞে আমার ছেলেবেলা থেকেই বড্ড ঘোড়ার শখ। আর ঘোড়ার জন্যই আঁকি। নইলে আঁকার তেমন ইচ্ছে আমার হয়নি কখনো।

তা আঁকার বিষয় হিসেবে ঘোড়াও কিছু খারাপ নয়। তবে অন্য বিষয়েও একটু আঁকিবুকি করলে ভালো হবে তোর। দুনিয়ায় ঘোড়া ছাড়াও কত কিছু আছে।

তা আছে। তবে পরাণের মনপ্রাণ জুড়ে কেবল ঘোড়াই লাফিয়ে—দাপিয়ে বেড়ায়। তা সে অবাধ্য হল না। সুধীরবাবুর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে নানা বিষয়ে ছবি আঁকার তালিম নিতে লাগল।

একদিন গিয়ে দেখে সুধীরবাবুর বাড়ির সামনে একখানা চকচকে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো। একজন বেশ বড়োলোকি চেহারার ফর্সামতো মানুষ চেয়ারে বসা। আর সুধীরবাবু তাঁকে পরাণের ছবিগুলো দেখাচ্ছেন।

তাকে দেখিয়ে সুধীরবাবু বললেন, এই এরই আঁকা। এর নাম পরাণ মণ্ডল। হাসির কথা হল এ ছেলেটার খুব ঘোড়ার শখ। পয়সা পেলে নাকি প্রথমেই একটা ঘোড়া কিনবে।

শুনে লোকটা একটু হাসল আর পরাণ খুব লজ্জা পেল।

লোকটা খানিকক্ষণ ছবিগুলো খুব মন দিয়ে দেখে হঠাৎ মুখ তুলে পরাণকেই জিজ্ঞেস করল, একটা ঘোড়ার দাম কত?

শুনে হাঁ করে রইল পরাণ। ঘোড়ার শখ তার আছে বটে, কিন্তু দরদাম সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। সে মাথা—টাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে, সেসব তো জানা নেই।

লোকটা ফের হেসে বলল, ঘোড়া কিনলেই তো হবে না, তার দানাপানির জোগাড় চাই, অসুখ হলে চিকিৎসা করানো চাই, যত্ন—আত্তি চাই।

অতসব কী পরাণ জানে? সে শুধু জানে, ঘোড়া টগবগ করে ছোটে, চিঁহিঁ বলে লাফায়, চামরের মতো লেজে ঝাপটা মেরে বাহার দেখায়। সে বলল, যে আজ্ঞে।

তোমার পাঁচটা ছবি আমার পছন্দ হয়েছে। এই নাও দাম।

বলে লোকটা পরাণকে একগোছা টাকা দিল, বেশ অনেক টাকা। হাতে পেয়ে পরাণের হাঁ—মুখ আর বন্ধ হয় না। তার হাবিজাবি ছবিরও যে একটা দাম হতে পারে এ সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে হাতজোড় করে বলল, ও ছবি আপনি এমনিই নিয়ে যান, টাকা দিতে হবে না আজ্ঞে। এ যে অনেক টাকা।

লোকটা স্মিতমুখে বলে, টাকা পেয়ে ঘাবড়ে যেয়ো না হে। তোমার অনেক টাকা হবে। তোমার ভিতরে যে মালমশলা আছে তা ভগবানের দেওয়া। দামটাও সেই জন্যই। সকলের কী আর ওসব মালমশলা থাকে?

তা পরাণের অবাক ভাবটা অনেকক্ষণ চেপে রইল তার ভোম্বল মাথায়। দুটো দিন কাজে কামাই দিয়ে উড়ু উড়ু মন নিয়ে মাঠে—ঘাটে ঘুরে বেড়াল সে। ব্যাপারটা এখনও সে তার বোকা মাথা দিয়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

সুধীরবাবু তাকে ডেকে বললেন, মজুরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ছবি নিয়ে পড়ে থাক। ও ছোটো কাজের আর তো দরকার নেই তোর। ডালভাতের অভাব না হলেই হল।

কাজ ছাড়ার কথা বলতে যেতেই গন্ধেশ্বর হাউরে মাউরে করে তেড়ে এ কাজ ছাড়বি মানে? ছাড়লেই হল? আমার তাহলে চলবে কী করে? আর তুই—ই খাবি কী?

পরাণ বলল, আজ্ঞে আমার অন্য উপায় হয়েছে। আর ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না, মজুর অনেক পাবেন।

গন্ধেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। চোখে জল। বলল, তা জানি। কিন্তু তোর সঙ্গে যে আমি আমার মেয়ে ফুলির বে দেবো বলে ঠিক করে রেখেছি।

পরাণ তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে জিব কেটে বলে, বিয়ে! ও বাবা, ওর মধ্যে আমি নেই। বউ বড়ো ঝামেলার জিনিস। তার ওপর ফুলি! সে পয়সাওলা বাপের আদুরে মেয়ে, আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করবে না।

গন্ধেশ্বর হাপুস নয়নে বলে, তা তুই কী পাত্তর খারাপ! সেই যে ডাকাতের হাত থেকে আমার প্রাণরক্ষে করতে মার খেয়েছিলি সেই থেকে তোকে এ বাড়ির সকলের পছন্দ। ফুলিরও ভারি ইচ্ছে।

পরাণ সবেগে মাথা নেড়ে বলে, সে হয় না।

গন্ধেশ্বর ফুঁসে উঠে বলে, দারোগাবাবুরও ইচ্ছে।

পরাণ ভারি মুশকিলে পড়ে গেল। দারোগাবাবু অনাদি সরখেল ভারি ভালো চোখে দেখেন তাকে। তাঁর অবাধ্য হওয়াটা কাজের কথা নয়।

গন্ধেশ্বর বলল, ওরে শোন, বিয়েতে আমি তোকে একটা ভালো ঘোড়া কিনে দেব বলে ঠিক করেই রেখেছি। তোর যে ভারি ঘোড়ার শখ সে কথা সবাই জানে কিনা।

পরাণ একটু হাঁ করে থেকে ঢোঁক গিলে বলল, তবে আর কথা কীসের? তা পরাণের এখন বউ হয়েছে, একটা শাঁসালো শ্বশুরবাড়ি হয়েছে, বেশ কিছু টাকাও হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা তার এখন একটা টগবগে, তেজি, দৌড়বাজ এবং দুষ্টু ঘোড়াও হয়েছে।
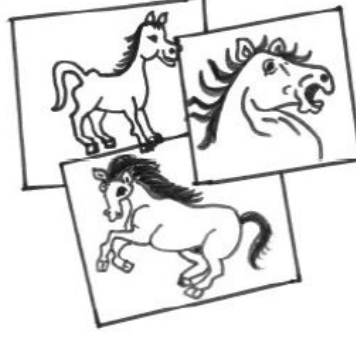
ভূতনাথের বাড়ি

'আচ্ছা মশাই, এদিকটাতেই কি ভূতনাথবাবুর বাড়ি?'

'না না, এ পাড়ায় ভূতনাথ বলে কেউ থাকে না।'

'কী আশ্চর্য! কিন্তু আমার কাছে যে ঠিকানাটা দেওয়া আছে তাতে স্পষ্ট লেখা অশ্বিনী মিত্র রোড, হাকিমপাড়া, তা এটা কি হাকিমপাড়া নয়?'

'তা হবে না কেন? এটা হাকিমপাড়া হতে বাধাটা কীসের? আটকাচ্ছে কে?'

'তাহলে অশ্বিনী মিত্র রোডটা?'

'এটা অশ্বিনী মিত্র রোডও বটে।'

'কিন্তু তাহলে ভূতনাথবাবুর বাড়িও তো এখানেই হওয়া উচিত।'

'না মশাই, কক্ষনো এখানে ভূতনাথবাবুর বাড়ি হওয়া উচিত নয়।'

'বলছেন! কিন্তু তা হয় কী করে? ভূতনাথবাবু নিজেই এই ঠিকানা দিলেন যে!'

'আর আপনিও অমনি ফস করে বিশ্বাস করে ফেললেন তো?'

'যে আজ্ঞে। ভূতনাথবাবুকে বিশ্বাস করা কী উচিত হয়নি মশাই?'

'বিশ্বাস করা না করা আপনার দায়। আমার তো নয়। তবে একথাও বলতে ইচ্ছে করে, কেউটে সাপ বা সোঁদরবনের বাঘকেও কী বিশ্বাস করা উচিত?'

'আজ্ঞে না। তাদের কথা আলাদা। বন্যপ্রাণী আর মানুষে তফাত আছে।'

'তফাতটা কী? তফাতটা কোথায়? ভূতনাথ বিশ্বাসকে যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে কেউটে সাপ বা সোঁদরবনের বাঘের দোষ কী বলুন!'

'আপনি বলতে চান ভূতনাথ বিশ্বাস সাপ বা বাঘের মতোই বিশ্বাসের অযোগ্য।'

'অতটা বলতে চাই না। তা ছাড়া আমি তো বলেই দিয়েছি, ভূতনাথ বিশ্বাস নামে কেউ এ পাড়ায় থাকে না।'

'তবে তিনি থাকেন কোথায়? সম্প্রতি কি বাসা বদল করেছেন?'

'করাই উচিত। বাসা বদলালে বহু মানুষের উপকারই হত। তবে ওসব আমি বলতে চাইছি না। তা আপনি আসছেন কোথা থেকে?'

'আমি আসছি নিশিগঞ্জ থানা থেকে।'

'অ্যাঁ! বলেন কী? থানা থেকে? আরে, তা আগে বলতে হয়। তা সার্চ ওয়ারেন্ট এনেছেন তো!'

'তা আর আনিনি! সার্চ ওয়ারেন্ট আছে, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে, আদালতের সমন আছে। আমার কাছে সবকিছু পাবেন।'

'বাঃ, বাঃ! এ তো খুব ভালো কথা মশাই! তা আসুন না, এই গরিবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন। কাছেই আমার বাড়ি। ওই যে সামনের লাল বাড়িটা।'

'তা মন্দ কী? পথ তো আর কম নয়। দুপুরের এই রোদে এতটা পথ আসতে বড়ো হাঁপসে পড়েছি মশাই।'

'আহা, আমারই দোষ। মান্যগণ্য লোক আপনি, এভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখাটা আমার ঠিক হয়নি। আসুন আসুন।'

'বাঃ, আপনার বাড়িটি তো বেশ।'

'সবাই তা বলে বটে। তবে এ আর এমন কী বলুন। হারু ঘোষের বাড়ি আরও পেল্লায়।'

'তা আপনার বাড়িই বা কম কীসে? ক—বিঘে জমি নিয়ে বাগানখানা করেছেন বলুন তো!'

'না না, জমি কোথায়! বাড়িখানাই তো অর্ধেক জমি গিলে খেল। এখন মোটে বিঘে দশেক পড়ে আছে।'

'বাপ রে! দশ বিঘে জমি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো জিনিস! তা মার্বেল বসিয়েছেন বুঝি মেঝেতে?'

'মার্বেলই বটে। তবে এক নম্বর সরেস জিনিসটা তো আর পেলাম না। তাই বাধ্য হয়ে ইটালিয়ান মার্বেলই বসাতে হল।'

'ইটালিয়ান মার্বেল! সে তো অনেক দাম মশাই। তার চেয়ে সরেস মার্বেল পাবেন কোথায়?'

'লোকে তাই বলে বটে। তবে এই অখাদ্য জায়গায় ভালো জিনিসের সমঝদারই বা কোথায় বলুন। বসুন তো, এই সোফায় বসুন। আমি বরং ঠান্ডা মেশিনটা চালিয়ে দিই। আপনার তো বেশ ঘাম হচ্ছে দেখছি।'

'ঠান্ডা মেশিনও লাগিয়েছেন? বাঃ, আপনার নজর তো খুব উঁচু।'

'কী যে বলেন! ওসব আজকাল হ্যাতাপ্যাতাদের ঘরেও থাকে। তা এই গরমে কী একটু লেবুর শরবত খাবেন?'

'না না, এসব ঝামেলা করতে হবে না। অন্য ডিউটি আমাদের এসব খেতে—টেতে নেই।'

'আহা ডিউটি করতে করতেই খাবেন। এক গেলাস শরবত বই তো নয়। দাঁড়ান, ভিতরে বলে আসছি। ... হ্যাঁ, তারপর বলুন তো, ভূতনাথের কেসটা কী?'

'খুব খারাপ কেস মশাই, খুব খারাপ কেস।'

'কত ধারায় মামলাটা ঠুকছেন?'

'ধারা—টারা উকিলের ব্যাপার, তারা বুঝবে। আমরা চার্জশিট দাখিল করব, তারপর কেস কোর্টে যাবে।'

'বাঃ বাঃ, এ তো খুব ভালো খবর মশাই। মা কালীকে জোড়া পাঁঠা মানত করা ছিল।'

'আচ্ছা, জোড়া পাঁঠা কেন মানত করেছিলেন বলুন তো!'

'অতি দুঃখেই মানত করতে হয়েছিল মশাই।'

'কিন্তু দুঃখটা কীসের?'

'সে আর বলবেন না। দুঃখ কী একটা? ভূতনাথের জ্বালায় এ পাড়ার সবাই অতিষ্ঠ। ধরুন কেউ হয়তো শীতলা পুজোয় একটু মাইক—টাইক লাগিয়েছে। তা পুজো—টুজোয় ও তো লোকে লাগিয়েই থাকে। ভূতনাথ তার দলবল নিয়ে এসে সব চোঙা—টোঙা খুলে নিয়ে যায়। তারপর ধরুন কেউ হয়তো রাস্তার ধারে একটু তরকারির খোসা বা মাছের আঁশ ফেলেছে, অমনি ভূতনাথ এসে কী হম্বিতম্বি! তারপর অধরবাবুর খিটখিটে বুড়ো বাপটা সারাদিন খাই খাই করে পেট নামিয়ে ফেলে, তাই অধরবাবুর বউ শ্বশুরকে বলেছিল, অত খাওয়া কী ভালো? হয়তো একটু ঝাঁঝের গলাতেই বলেছিল, তাইতে ভূতনাথ এসে চড়াও হয়ে মানবাধিকার কমিশনের ভয় আর সামাজিক বয়কটের জুজু দেখিয়ে কী অত্যাচারটাই না করে গেল। ওই

যে নবকুমার, তার দোষ হয়েছিল, বাগানের পাঁচিলটা তোলার সময় মাপজোকের ভুলে রাস্তার খানিকটা সীমানায় ঢুকে যায়। ভূতনাথ সেই দেয়াল ভাঙিয়ে তবে ছাড়ল।'

'এ তো ভূতনাথের খুব অন্যায়!'

'অন্যায় নয়? আমাকেই কী কম জ্বালাতন হতে হচ্ছে মশাই? শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে কোনোমতে বাড়িটা খাড়া করেছি, ভূতনাথ এসে রোজ দলিল দেখতে চায়, ভয় দেখায়। আমি নাকি সরলাবালা নামে এক বিধবার জমি চালাকি করে লিখিয়ে নিয়েছি।'

'লিখিয়ে নেননি তো!'

'তা লিখিয়ে নেব না কেন? নিয়েছি বই কী। কিন্তু তার জন্য তিন কিস্তিতে ন্যায্য দামও সরলাবালাকে মিটিয়ে দিয়েছি। রসিদও আমার কাছে আছে। কিন্তু কলিকাল তো, ভালো মানুষদের বড়ো দুর্দিন। ভূতনাথ আমার বিরুদ্ধে লোককে খেপিয়ে তুলছে।'

'না—না, এসব তো ভালো কথা নয়।'

'আপনারা পাঁচজন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এসে দেখুন কতবড়ো অবিচার এবং অনাচার চলছে এখানে। ওই যে, মিষ্টিটুকু মুখে দিয়ে ঠান্ডা ঘোলটা একচুমুকে মেরে দিন তো, শরীর ঠান্ডা হবে।'

'ও বাবা। এত আয়োজন! না মশাই, আমার পক্ষে দশ—বারোটা মিষ্টি খাওয়া সম্ভব নয়। আমি পেটরোগা মানুষ।'

'আহা, আপনি তো ইয়ংম্যান। কতটা হেঁটে আসতে হয়েছে। লজ্জা করবেন না, খেয়ে নিন।'

'তাহলে ভূতনাথবাবুর জন্য আপনারা শান্তিতে নেই?'

'না মশাই, সে বিদেয় হলে বাঁচি। তা তার বিরুদ্ধে কীসের মামলা বলুন তো! খুন—জখম—রাহাজানি, নাকি চারশো বিশ ধারা, নাকি ট্যাক্স ফাঁকি?'

'কেসটা আমি খুব ভালো জানি না। তবে তার নামে সরকারি চিঠি আছে।'

'সেই চিঠিতে কী আছে মশাই? যাবজ্জীবন হলে খুব ভালো হয়, ফাঁসি হলে তো চমৎকার, নিদেন আট—দশ বছরের কয়েদ তো বোধ হয় হচ্ছেই। কী বলেন?'

'তাও হতে পারে। সবই সম্ভব। আচ্ছা, আপনার কি একটা দশ লাখ টাকার ব্যাঙ্ক লোন আছে?'

'অ্যাঁ! ব্যাঙ্ক লোন! দাঁড়ান, মনে করে দেখি! আচ্ছা আচ্ছা মনে পড়ছে, একটা লোন যেন ছিল! তা তো এতদিনে শোধ করে যাওয়ার কথা! গেছেই বোধ হয়। তা এ—খবর কে দিল আপনাকে? ভূতনাথ নাকি?'

'জয়কৃষ্ণ সরখেল তাঁর বাড়িঘর আপনার কাছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় বাঁধা রেখেছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর কি আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকার দাবিতে তাঁর নাবালক পুত্র—কন্যাকে বের করে দিয়ে জমি—বাড়ি দখল করেছেন?'

'এই দ্যাখো কাণ্ড! তাই বলেছে বুঝি ভূতনাথ? একদম বিশ্বাস করবেন না মশাই, আমার বড্ড নরম মন। পাঁচ হাজার নয়, অনেক বেশিই নিয়েছিল জয়কৃষ্ণ। কাগজপত্র সব পরিষ্কার।'

'না, আপনি যে ভালো লোক তা যেন বুঝতে পারছি। তবে কিনা সেটা প্রমাণ করা বেশ শক্ত হবে। কলিকাল তো। এই কলিকালে ভালোমানুষদের যে কষ্ট পেতেই হয়। চলুন মশাই কষ্ট করে একটু থানায় চলুন। বড়োবাবু আপনার জন্য বসে আছেন।'

'সে কী? আর ভূতনাথ?'

'তাকে তো সরকার কী খেতাব—টেতাব দেবে বলে শুনছি। সেই চিঠিও আমার সঙ্গেই আছে।'

সংবর্ধনা

'এই যে বিশুবাবু, নমস্কার। শুনলাম আপনার মামাশ্বশুর নাকি লটারি পেয়েছেন?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'তা কত টাকা পেলেন তিনি?'

'ভালোই পেয়ে থাকবেন। পাঁচ—দশ লাখ পেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

'তাহলে বিশুবাবু, এ তো বেশ গৌরবের কথাই, কী বলেন? লটারি ক—জন পায় বলুন। লটারি পাওয়া মানে তো দশজনের একজন হয়ে ওঠা। এই গৌরবজনক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে কি আপনার কিছু করা উচিত নয়? মামাশ্বশুর তো আর পর নয়। আমাদের সকলেরই তো মামাশ্বশুর আছে, কেউ তো এমন বিরল কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। আমার মামাশ্বশুর তো হাড়হাভাতে। আপনার কি মনে হয় না যে লটারি জেতার জন্য ওঁকে প্রথমে একটা গণ ও পরে একটা নাগরিক ও তারও পরে একটা পুর সংবর্ধনা দেওয়া উচিত!'

'তা তো বটেই।'

'এ বিষয়ে একটা কমিটিও কি অবিলম্বে গঠন করা উচিত নয়? লটারিতে জয় তো চাট্টিখানি কথা নয়। লাখ লাখ লোক প্রতিদিন লটারি খেলছে, কিন্তু প্রাইজ পায় ক—জন বলুন!'

'অতি ঠিক কথা।'

'এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা প্রায় ত্রিশ বছরের। ত্রিশ বছরে মোট সাতশো একত্রিশজনকে নানারকম কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা আমিই করেছি। ব্যায়ামবীর বলরাম শীল, নৃত্যশিল্পী কল্লোলিনী কয়াল, জাদুকর পি পাল, সাঁতারু বিপ্লব বসুর মতো বিখ্যাত লোকেরা তো আছেই। তা ছাড়া ধরুন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরল কৃতিত্বের জন্য আমরা পাঁচু চোর, পরেশ পকেটমার, গুল মারার জন্য গয়েশ গায়েন—এদেরও বাদ দিইনি। সংবর্ধনায় আমার খুব হাতযশ।'

'শুনে বড্ড খুশি হলাম। আপনি করিতকর্মা লোক।'

'আজ্ঞে সবাই তাই বলে, তবে এটাকে আমি দেশ বা দশের সেবা বলেই মনে করি। অনেকেই বলে বটে, নিতাইবাবুর মতো এরকম আত্মত্যাগ, এরকম কর্মোদ্যাগী এতবড়ো সংগঠক বড়ো একটা দেখা যায় না, কিন্তু আমি ভাবি, এটা তো আমার পবিত্র কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কী বলেন?'

'না না, তা বললে হবে কেন? আপনি বিনয়ী মানুষ বলেই কৃতিত্ব স্বীকার করতে চাইছেন না। কিন্তু আত্মত্যাগ ক—টা লোক আর করছে বলুন।'

'সে অবশ্য ঠিক কথা। সেদিন নবীনবাবু তো বলেই ফেললেন, নিতাইবাবু, আপনি দেশের যুবসমাজের কাছে এক জ্বলন্ত উদাহরণ।'

'নবীনবাবু ঠিকই বলেছেন।'

'আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে এভাবে জনগণের সেবা যেন আজীবন করে যেতে পারি।'

'সে তো বটেই। সেবাটা চালিয়ে যাওয়াই উচিত।'

'তবে কিনা সেবা করতে করতেই জীবনটা কেটে যাচ্ছে, নিজের দিকে আর তাকাতে পারলাম কই বলুন।'

'দেশসেবকরা, জনগণের সেবার্তরা নিজের দিকে তো তাকায় না। তাকাতে নেইও।'

'এই আপনার মামাশ্বশুরের কথাই ধরুন, আমরা পাঁচজন তাঁর কৃতিত্বের কথা সর্বসমক্ষে তুলে না ধরলে একটা জাতীয় কর্তব্যকেই কি অবহেলা করা হবে না? আগামী রোববারই আমরা সংবর্ধনা কমিটি তৈরি

করছি। লোকের অনুরোধে আমি সভাপতি হতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়েছি।'

'আপনার মতো কৃতী লোক থাকতে অন্য কাউকে সভাপতি করা হবেই বা কেন বলুন। সেটা যে গুরুতর অন্যায় হবে।'

'হেঁঃ হেঁঃ, সেইজন্যই রাজি হতে হল। সংবর্ধনা তো চাট্টিখানি কথা নয়! হল ভাড়া করা, ফুলের তোড়া, মালা ইত্যাদির জোগাড়, তারপর ধরুন উদবোধনী সংগীতের আর্টিস্ট, এসব তো লাগবেই। সংবর্ধনার পর জনগণের মনোরঞ্জনেরও তো একটু ব্যবস্থা রাখতে হবে না কী? তার জন্য কিশোরকণ্ঠী, মুকেশকণ্ঠী, হেমন্তকণ্ঠী কয়েকজন আর্টিস্টকে আনা, একটা মূকাভিনয়, একটু ম্যাজিক—ট্যাজিক, তারপরে একখানা নাটক, হরবোলা, অর্কেস্ট্রা কোনটা না হলে চলে বলুন। মাইকের ভাড়া, জলযোগের ব্যবস্থা এসবও তো না করলেই নয়।'

'যে আজ্ঞে। এসব তো সংবর্ধনার চিরকালীন অঙ্গ, বাদ দিলে অঙ্গহানি হবে।'

'খরচাপাতিও আছে, তা ধরুন গিয়ে হাজার বিশেক টাকা হলে ম্যানেজ করে নেওয়া যায়।'

'বিশ হাজার তো আজকালকার বাজারে কিছুই নয়! আপনি ভালো সংগঠক বলেই হয়তো ম্যানেজ করতে পারবেন।'

'যে আজ্ঞে, তবে ওটা জনগণের চাঁদা থেকেই তুলে নিতে হবে। আর বাকি হাজার বিশেক টাকা যদি আপনার মামাশ্বশুরকে বলে একটা ডোনেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আর ভাবনা থাকে না। লটারিটা তো হেলায় জয় করেছেন, ওই সামান্য টাকা ওঁর গায়েই লাগবে না।'

'সে আর বেশি কথা কী? যিনি লটারি মেরেছেন তার তো আর টাকার অভাব নেই। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।'

'নিশ্চিন্ত হতে পারি তো?'

'নিশ্চয়ই। তবে মামাশ্বশুরকে বলে টাকা আদায় করতে একটু সময় লাগবে।'

'কেন বলুন তো, উনি কি খুব ব্যস্ত?'

'তা ব্যস্তই বোধ হয়। লটারি পেলে সকলেই তো খুব ভিআইপি হয়ে ওঠে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। আপনি বরং আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।'

'সেটাও শক্ত নয়, তবে দেরি হবে।'

'আচ্ছা, এই দেরিটার কথা বারবার বলছেন কেন বলুন তো! নিজের মামাশ্বশুরের সঙ্গে কি আপনার সদ্ভাব নেই?'

'আজ্ঞে সদ্ভাব থাকারই তো কথা ছিল।'

'তবে দেরি হবে কেন?'

'লজ্জার কথা হল তাঁকে খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগবে।'

'বলেন কী? তিনি কি লটারি পেয়ে সাধু বা পাগল বা বিবাগি হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন? লটারি পাওয়ার শক অবশ্য অনেকে ঠিক সামলাতে পারে না।'

'সেরকম হতে পারে। আমার কাছে সঠিক তথ্য নেই। তবে সময় দিলে আমি তাকে ঠিকই খুঁজে বের করব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সাক্ষাৎ মামাশ্বশুর বলে কথা। তার ওপর শাঁসালো মানুষ। এরকম মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে আমাদের কাজকারবারই চলবে কীসে?'

'ঠিক কথাই, তবে আপনার অনুরোধ আমার মনে থাকবে। আমি তাকে খুঁজে বের করবই।'

'কত দেরি হবে বলতে পারেন?'

'তা দু—চার বছর ধরে রাখুন।'

'অ্যাঁ! সর্বনাশ! দু—চার বছর কী বলছেন মশাই? তাহলে সংবর্ধনার কী হবে? পাড়ার ক্লাবের ছোকরারা যে আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। বলি পুলিশে খবর দিয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে না, পুলিশকে এখনও জানানো হয়নি অবশ্য। তবে ঘটককে বলা হয়েছে বলে শুনলাম।'

'ঘটক! এর মধ্যে ঘটক আসছে কেন? লটারি পেয়ে আপনার মামাশ্বশুর কি আরও বিয়ে করতে চান নাকি?'

'তা চাইতেও পারেন। আমার ঠিক জানা নেই, তবে ঘটক ছাড়া তাকে খুঁজে বার করা মুশকিল।'

'কেন বলুন তো! ঘটকের ভূমিকাটা কী?'

'উনিই খুঁজে আনবেন কিনা, অবশ্যি মামাশ্বশুরের আগে তার ভাগনিকেই খুঁজে পাওয়া দরকার।'

'ভাগনি! আচ্ছা মশাই, ভাগনির কথা উঠছে কেন?'

'যার ভাগনি নেই তার যে মামাশ্বশুর হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতাই নেই, এটা তো মানবেন!'

'সে তো ঠিকই, কিন্তু আপনার মামাশ্বশুরের অসুবিধাটা কী?

'সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করা যেতে পারত যদি তিনি বিধিমতো আমার মামাশ্বশুর হতেন।'

'বাধাটা কোথায়?'

'মামাশ্বশুর হননি বলেই বাধা, যার মামাশ্বশুর থাকে না সে যে অতি হতভাগ্য তা আজ আপনার কথা শুনেই বুঝলাম। ব্যাপারটা হল আপনার কথামতো লটারি জেতা মামাশ্বশুর খুঁজতে হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'সবই যে গুলিয়ে দিচ্ছেন মশাই।'

'ব্যাপারটা গোলমেলে ঠিকই, কথাটা হল মামাশ্বশুর বা নিদেন তার ভাগনিটিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে সমস্যাটা জটিলই থেকে যাবে। প্রথম তার ভাগনিকে খুঁজে বার করা, পাত্রী দেখা, বিয়ের জোগাড়যন্তর করা, বিয়ে হওয়া— এই এতসব কাণ্ডের পর তবে না আপনি আমার মামাশ্বশুরের নাগাল পাবেন?'

'তার মানে কী আপনার মামাশ্বশুরই নেই বিশুবাবু?'

'আজ্ঞে না। মামাশ্বশুর নেই, তার ভাগনির সঙ্গে আমার বিয়েটাই যে হয়নি এখনও, আর আমি বিশুবাবুও নই।'

'তাহলে তো মুশকিলে ফেললেন মশাই। সংবর্ধনাটা কি ভেস্তে যাবে তাহলে? সংবর্ধনার জন্য যে পাড়ার ছেলেগুলো খেপে উঠেছে।'

'আহা, তাতে আটকাচ্ছে কেন? আপনার মতো একজন কৃতী মানুষকেও তো জনগণের সংবর্ধনা দেওয়া উচিত।'

'তা অবশ্য খুব একটা খারাপ বলেননি, তাহলে দিন তো মশাই, শতখানেক টাকা চাঁদা দিন, নিজের সংবর্ধনাটা সেরে ফেলি।'

'সেই ভালো, কিন্তু ওই যাঃ, অত টাকা যে সঙ্গে নেই!'

'কত আছে?'

'দাঁড়ান, বোধ হয় টাকা পাঁচেক হতে পারে।'

'তাই বা মন্দ কী! কাটছাঁট করে ওতেও সংবর্ধনা দেওয়া যাবে। দিন, পাঁচ টাকাই দিন।'

বিপিনবাবুর কাণ্ড

নন্দবাবু বাজারে চলেছেন। বাঁ—হাতে ছাতা, ডান হাতে বাজারের থলি, পকেটে টাকা আর ব্রহ্মতালুতে রাগ। তা রাগ হওয়ারই কথা। গতকাল বিকেল থেকে তার প্রিয় দুধেল ছাগল রাইকিশোরীর খোঁজ নেই। ছোটোছেলে মদন গতকাল সিংহিদের ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে ঠ্যাং ভেঙেছে। গিন্নির সোনার বালা চুরি হওয়ায় গিন্নি আজ সন্দেহবশে পুরোনো ঝি হিরামোতিকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন, পরে যদিও বালাটা বালিশের নীচে পাওয়া যায়। তাঁর বড়োশালা ভুল করে তার পুরোনো চটি ছেড়ে রেখে নন্দবাবুর নতুন চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে চলে গেছে। বাইরের ঘরের ঘড়িটা দশ মিনিট লেট চলছে বলে আজও তাঁর বাজারে বেরোতে দেরি হয়ে গেছে। আরও আছে। কিন্তু অতসব বলতে গেলে মহাভারত। রাগের চোটে নন্দবাবু একটু জোরেই হাঁটছেন।

হঠাৎ সামনে পথ আটকে একজন বিগলিত মুখের লোক দাঁত বের করে বলল, 'নন্দবাবু না? কী সৌভাগ্য!'

লোকটা বেজায় বেঁটে, একটু রোগা, কালো এবং মুখে ধূর্তামির ছাপ আছে। নন্দবাবু লোকটাকে কস্মিনকালেও দেখেননি।

নন্দবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি কে? কী চাই?'

'আজ্ঞে আমি হরিপদ, হরিপদ পাল।'

'ও, তা হরিপদবাবু, আমার খেজুরে আলাপ করার সময় নেই। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যা বলার চটপট বলুন।'

'ছি ছি, দেরি করিয়ে দিলাম নাকি? তা চলুন, বাজারের দিকে যেতে যেতেই দুটো কথা বলি।'

'কী কথা?'

'বলছিলাম কী বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'বিপিনবাবু কে?'

'আহা, বিপিনবাবু হলেন যোগেনবাবুর শালা।'

'যোগেনবাবু কে?'

'চিনলেন না! যোগেনবাবু হলেন নরেনবাবুর ভাইপো।'

'নরেনবাবু কে?'

'কী মুশকিল! নরেনবাবু যে সুধাংশুবাবুর নাতজামাই।'

'সুধাংশুবাবু কে?'

'ওই তো বললাম, উনি হলেন নরেনবাবুর দাদাশ্বশুর। আর নরেনবাবু হলেন যোগেনবাবুর জ্যাঠা। আর যোগেনবাবু হলেন বিপিনবাবুর ভগ্নীপতি। এবার বুঝলেন?'

'জলের মতো পরিষ্কার। এদের কাউকেই আমি চিনি না।'

'আহা চেনার দরকারটাই বা কী? কথাটা হল বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'আজ্ঞে না।'

'উঃ, সে সাংঘাতিক কাণ্ড। কাউকে না বলে—কয়ে বিপিনবাবু যে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে গেছেন।'

'তাই নাকি? তাহলে তো চিন্তার কথা। কিন্তু আমার যে বিপিনবাবুকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।'

'মাথা ঘামাবেনই—বা কেন? শুধু বলছি ভদ্রলোকের কাণ্ডটা দেখলেন? বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ি থেকে জলজ্যান্ত মানুষটা গায়েব!'
'তাহলে পুলিশে খবর দিন।'
'আহা, পুলিশ তো তাঁকে আগে থেকেই খুঁজছিল।'
'তাই নাকি?'
'তা খুঁজবে না? তিনি যে ঢিল ছুড়ে নিত্যানন্দবাবুর অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছেন।'
'ও, তা হলে তো ভীষণ ব্যাপার! কিন্তু এই নিত্যানন্দবাবুটি আবার কে?'
তিনি হলেন নবকৃষ্ণ দারোগার পিসেমশাই। আর নবকৃষ্ণ দারোগা হল শ্যামাপদর খুড়তুতো ভাই। আর শ্যামাপদ হল তো চারুবাবুর ভাগনে। আর চারুবাবু হলেন...'
'থাক থাক, ওতেই হবে।'
'তাহলে থাক। কথাটা হচ্ছে বিপিনবাবুকে নিয়ে।'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিপিনবাবুর কথাটাই বরং হোক।'
'তাই বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'
'হ্যাঁ, বললেন তো, উনি নিরুদ্দেশ।'
'নিরুদ্দেশ বলতে নিরুদ্দেশ! একেবারে গায়েব। কোথাও তাঁর টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। দিগন্তের চিলের মতো উড়তে উড়তে বিলীন হয়ে গেছেন।'
'বাঃ, এ তো কাব্য হয়ে গেল দেখছি।'
লোকটা খুব লজ্জা—টজ্জা পেয়ে হাতটাও কচলে বলল, 'একটু—আধটু আসে আর কী। কবি তমাল রায়ের কাছে তালিম নিয়েছিলাম কিছুদিন।'
'বাঃ বাঃ। কবি তমাল রায়ের নামটা অবশ্য শুনিনি।'
'তিনি হলেন কবি সব্যসাচী কাব্যবিশারদের সাক্ষাৎ ভাইঝি জামাই। সব্যসাচী কাব্যবিশারদ হলেন গিয়ে নটবর বিদ্যাবিনোদের ভায়রাভাই। আর নটবর বিদ্যাবিনোদ হলেন গিয়ে....'
'থাক, থাক, কথাটা হচ্ছিল বিপিনবাবুকে নিয়ে।'
'হ্যাঁ, কথাটা বিপিনবাবুকে নিয়েই।'
'সেটাই হোক।'
'তাই বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'
'হ্যাঁ, উনি দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছেন।'
'বিলীন বলতে বিলীন! একেবারে কর্পূরের মতো উবে গেছেন। অথচ বাড়িতে ছেলে কাঁদছে, বউ কাঁদছে, মা কাঁদছে, পাওনাদাররা কাঁদছে।'
'তাহলে তো খুবই খারাপ ব্যাপার।'
'খারাপ বলতে খারাপ! শিবু গয়লার দুধ বাবদ একশো বত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাওনা, পঞ্চানন মুদির পাওনা দু—শো একান্ন টাকা পঁচিশ পয়সা, রহমত দর্জি পাবে একান্ন টাকা পঁচাত্তর পয়সা, পাড়ার মুচি পায় তেরো টাকা কুড়ি পয়সা, খবরের কাগজওয়ালার কাছে বাকি পড়ে আছে একাশি টাকা একান্ন পয়সা, বাড়িওয়ালার দু—মাসের ভাড়া তিনশো চল্লিশ টাকা, বনবিহারীর কাছে মাসকাবারে ধার নিয়েছিলেন আড়াইশো টাকা, গজপতির কাছে দেড়শো, সরখেলবাবুর কাছে ত্রিশ টাকা...'

'বিপিনবাবু বেশ ধারালো লোক ছিলেন দেখছি।'

'শুধু কী এই? ফুচকাওয়ালা, বাদামওয়ালা, অফিসের পিয়োন— তাদের হিসেব তো এখনও ধরিনি।'

'তাহলে আর ধরবেন না।'

'তাই বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'একটু একটু দেখতে পাচ্ছি।'

'সংসারটা ভেসে যাচ্ছে একেবারে। চাল নেই, ডাল নেই, নুন নেই, তেল নেই।'

'সত্যিই খুব দুঃখের কথা, কিন্তু বিপিনবাবু গেলেন কোথায়? ভালো করে খুঁজে দেখেছেন?

'গোরু খোঁজা মশাই, গোরু খোঁজা। এই তো সামতাবেড়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ি, পিসির বাড়ি গাইঘাটা, ভাই থাকে কার্মাটারে, দাদা বিষ্ণুপুর, বড়োশালা নবদ্বীপ, ছোটোশালা দুর্গাচক, বড়োশালি গয়েশপুর, মেজোজন হিঙ্গলগঞ্জ, ছোটো শিমুলতলা, বড়োকাকা রানাঘাট, ছোটোকাকা পাঁশকুড়া, খুড়তুতো ভাই একজন কিশোরপুর, অন্য জন কেওনঝড়, বড়োমামা জলপাইগুড়ি....'

'থাক থাক। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি তো!'

'এক্কেবারে না। রবি ঠাকুরের ভাষায় উনি একদম ভোঁ হয়ে গেছেন, না হয়ে গেছেন।'

'আহা খুব দুঃখের কথা।'

'খুব, চোখের জল রাখা যায় না মশাই। তাই আমরা সবাই মিলে নিখিল ভারত বিপিন বাঁচাও কমিটি তৈরি করেছি। বিপিনবাবু ভোঁ ভোঁ হলেও সংসারটা তো আছে। সেটাকে তো আর ভেসে যেতে দেওয়া যায় না।'

'সে তো ঠিকই।'

'কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সতীশ ঘোষ। চিনলেন তো। এই যে সুরেনবাবুর বড়োমেসো, সুরেনবাবুকে নিশ্চয়ই জানেন, হারান বোসের...'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কথাটা হচ্ছিল বিপিনবাবুকে নিয়ে।'

'তা তো বটেই। তা বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'দেখছি মশাই, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, সবাই দেখছে। তা সেই বিপিন বাঁচাও কমিটির সেক্রেটারি হলেন গিয়ে গিরিধারী হালদার, যার শালা মাধব রায় গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সাঁতার কেটে বিখ্যাত, সেই মাধব রায় যার তালুইমশাই হল গিয়ে গোবিন্দ বিশ্বাস...'

'থাক থাক, বিপিনবাবুর কথাটাই হোক।'

'তাই হোক। নিখিল ভারত বিপিন বাঁচাও কমিটির আজীবন সদস্যপদ চাঁদা মাত্র দু—হাজার টাকা, দশ বছরের হল দেড় হাজার, পাঁচ বছর হলে হাজার, এক বছরের জন্য মাত্র দু—শো, ছ—মাসের সদস্যপদ...'

'থাক, থাক। তা আমাকে কত দিতে হবে?'

লোকটা জিভ কেটে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, আপনার কাছে সেই উদ্দেশ্যে আসা নয়। তবে কিনা সবাই শুনে দুঃখ পায়। দুঃখ পেলে লোকে ভাবতে বসে। ভাবতে বসলে লোকের চোখে জল আসে। চোখে জল এলে লোকের মন গলতে থাকে। আর মন গলতে শুরু করলে হাত দিয়ে পকেটে ঢোকে...'

'থাক, থাক। কত?'

'কী যে বলেন? তা গোটা পাঁচেক যদি হয়, কোনো চাপাচাপি নেই কিন্তু।'

নন্দবাবু টাকাটা দিয়ে বললেন, 'চাপাচাপি নেই বলছেন? ওরে বাবা!'

লোকটা একটু লাজুক হেসে বলল, 'লোকে অবশ্য বিপিন বাঁচাও কমিটিকে খুবই গালমন্দ করছে, মামলামোকদ্দমা করবে বলে শাসাচ্ছে, ঝগড়াঝাঁটিও লেগে যাচ্ছে। তাই বলছিলাম বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

বলাইবাবু

'বাঃ, আপনার কুকুরটি কিন্তু ভারি সুন্দর বলাইবাবু।'

'কুকুর, কোথায় কুকুর!'

'ওই তো, আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে।'

'অ! না মশাই, ওটা আমার কুকুর নয়।'

'অ! ইস দেখুন তো, আপনার কুকুর মনে করে গতকালও যে ওকে আমি লেড়ো বিস্কুট কিনে খাইয়েছি! বিস্কুটের আজকাল যা দাম হয়েছে, কহতব্য নয়। পয়সাটা কি তবে জলে গেল?'

'কিন্তু মশাই, আমার কুকুর মনে করে ওকে লেড়ো বিস্কুট খাওয়াতে গেলেন কেন? আমার কুকুরকে লেড়ো বিস্কুট খাওয়ানোয় আপনার লাভ কী?'

'আছে, ও আপনি বুঝবেন না। সামান্য একটা লেড়ো বিস্কুটই তো! তবে ও কিন্তু গতকালও আপনার পিছু পিছু বাজার অবধি গিয়েছিল। পরশুদিনও। এমনকী তার আগের দিনও।'

'অবাক কাণ্ড! কুকুরটা রোজ আমার পিছু নেয়, আমি তো তা জানতাম না।'

'আমার যতদূর মনে হয়, কুকুরটা লোক চেনে। আপনি যে একজন মহান লোক তা কুকুরটা বুঝতে পেরেছে।'

'আমি মহান লোক! তা মশাই, মহান কথাটার মানে কী দাঁড়াচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারেন? জীবনে কখনো কেউ আমাকে মহান বলেনি। শুনে বড়ো অবাক লাগছে।'

'কী যে বলেন বলাইবাবু। মহান কথাটার জন্মই তো হল আপনার জন্য। ও কথাটা আর কারও গায়ে তেমন ফিট করে না, কিন্তু আপনার গায়ে একদম মাপে মাপে বসে যায়।'

'বটে!'

'তা নয়! সবাই জানে আপনার মানুষের জন্য প্রাণ কাঁদে, আপনি দু—হাতে গরিব—দুঃখীকে বিলিয়ে দেন, আপনি মানুষের বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়েন, নিতান্ত সামান্য মানুষকেও সম্মান দিয়ে কথা বলেন, জীবজন্তুর প্রতি আপনার প্রেম তো সর্বজনবিদিত।'

'চিন্তায় ফেলে দিলেন মশাই। আমি মানুষকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না। বাড়িতে ভিক্ষুক এলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কারণ অধিকাংশ ভিক্ষুকই প্রফেশনাল নিষ্কর্মা। মানুষ নিজের দোষে বিপদে পড়ে বলে আমি কারও বিপদ—আপদে বোকার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি না আর অধিকাংশ মানুষই সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয় বলে তাদের আমি পোকামাকড়ের বেশি মনে করি না। আরও একটা কথা, কুকুর বেড়াল ইত্যাদি নানা রোগজীবাণু বহন করে বলে আমি তাদের সযত্নে এড়িয়ে চলি।'

'আহা বলাইবাবু, এসবও তো বিবেচকের মতোই কাজ। আর তাতে আপনার মহান হতে আটকাচ্ছে কীসে?'

'তাতেও আটকাচ্ছে না! তাজ্জব করলেন মশাই!'

'আজ্ঞে, দু—চারটে গুণ বাদ গেলেও ক্ষতি নেই। গান্ধীজি কি ফুটবল খেলতে পারতেন?'

'বোধ হয় না। কিন্তু হঠাৎ একথা কেন?'

'আচ্ছা, বিদ্যাসাগরমশাই কি গান জানতেন?'

'জানি না তো!'

'রবিঠাকুর কি ক্যালকুলাস জানতেন?'

'না জানাই সম্ভব।'

'তা বলে কি তাঁরা মহান নন?'

'তা বটে। তাহলে আপনি আমাকে মহান বানিয়েই ছাড়বেন।'

'আজ্ঞে না! আমি বলতে চাইছিলাম যে, আপনি মহান হয়েই জন্মেছেন। তা আপনি যতই নিজেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুন। আর এটাও আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে, নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা মহানদেরই লক্ষণ।'

'আমি মশাই, নিজেকে মোটেই তুচ্ছ জ্ঞান করি না। আমি বিলক্ষণ জানি যে, আমি একটি বড়ো কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সেজন্য আমার যথেষ্ট অহংকারও আছে।'

'বলাইবাবু, ওই অহংকারও আপনাকে মানায়।'

'আচ্ছা মশাই, আপনি তো গায়ে পড়ে অনেক কথা বলছেন। কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না! আপনি কে বলুন তো!'
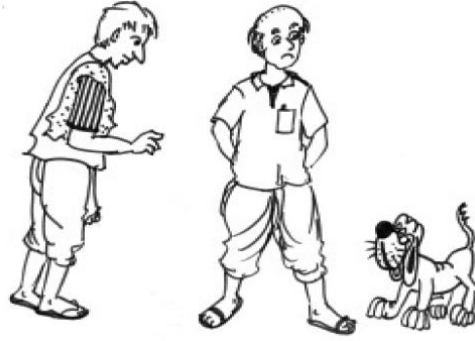
'কী যে বলেন, আমাকে চিনতে যাবেন কোন দুঃখে? উঁচু সার্কেলের লোকদের কাছে দেওয়ার মতো পরিচয় তো নয়।'

'সে তো আপনার হাড়হাভাতে চেহারা আর পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবু নামধাম জেনে রাখা ভালো।'

'নাম হল ধর্মদাস ঘোষ।'

'কী করা হয়—টয়?'

'ওই সামান্য একটু ডাক্তারি করে থাকি। হোমিয়োপ্যাথি।'

'তা মন্দ কী? হোমিয়োপ্যাথদের তো আজকাল বেশ পসার শুনেছি।'

'তা আজ্ঞে কিছু কিছু মানুষ ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। তারা যাতে হাত দেয় তাতেই সোনা ফলে। তবে কিনা হোমিয়োপ্যাথিতে আমি তেমন সুবিধে করে উঠতে পারিনি। তাই ওর সঙ্গে একটু জ্যোতিষচর্চাও করে থাকি।'

'ওরে বাবা, আপনি জ্যোতিষীও?'

'ওই যে বললাম, কপাল ভালো থাকলে সবকিছুতেই হাতযশ হয়। কিন্তু আমার জ্যোতিষবিদ্যারও তেমন কদর হয়নি।'

'এবার বলুন তো ধর্মদাসবাবু, আজ গায়ে পড়ে এই খেজুর করার উদ্দেশ্যটা কী?'

'আজ্ঞে, গত কয়েকদিন ধরেই আপনাকে আমি ফলো করছি।'

'ফলো করছেন! আশ্চর্য ব্যাপার! ফলো করছেন কেন?'

'আজ্ঞে পদাঙ্ক অনুসরণও বলতে পারেন। ভাবলাম কৃতবিদ্য লোক আপনি, বিশাল ডিগ্রি, বিশাল চাকরি, বিশাল নামডাক, তা আপনার হাওয়া—বাতাস গায়ে লাগলেও উপকার আছে। তাই রোজই, আপনি যখন আর পাঁচজনের মতো বাজার করতে বেরোন, তখন আমি আপনার পিছু নিই।'

'কারও পিছু নেওয়া যে অভদ্রতা সেটা নিশ্চয়ই জানেন!'
'যে আজ্ঞে।'
'এরজন্য আপনাকে আমি পুলিশে দিতে পারি তা জানেন?'
'পারেন বই কী। মানগণ্য লোক আপনি, পুলিশকে ডাকলে তারা ধেয়ে আসবে। উটকো লোক আমি, কী উদ্দেশ্যে ফলো করছি এটাও তো ভাববার কথা।'
'যাকগে, আমি পুলিশ ডাকছি না। আপনিও আর ফলো করবেন না।'
'আজ্ঞে। তবে কিনা ওই কুকুরটাও কিন্তু রোজই আপনাকে ফলো করে।'
'কুকুরটা কেন ফলো করে তা আমি জানি না, তবে তার উদ্দেশ্য ততটা সন্দেহজনক না—ও হতে পারে।'
'যে আজ্ঞে। আপনি বিবেচক মানুষ।'
'আপনার কি আর কিছু বলার আছে?'
'তেমন কিছু নয়। না বললেও চলে। আপনার হাতে হয়তো এত সময়ও নেই। ব্যস্ত মানুষ আপনি, বাজার করে এসে চাট্টি খেয়েই হয়তো অফিসে রওনা হবেন। আজ অবশ্য শনিবার, আপনার ছুটি। তা হলেও হয়তো বিকেলের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর বা লন্ডন যাওয়ার আছে, কিংবা নিদেন দিল্লি—টিল্লি।'
'সিঙ্গাপুর। খবর—টবর রাখেন দেখছি।'
'কী যে বলেন! হোমরাচোমরা মানুষরা যা করেন তাই খবর। এমনকী হেমন্ত আগরওয়ালের সঙ্গে পার্টিতে একটু আবডাল হয়ে কথা বললেও খবর, কিংবা দুবাইয়ের নটবরলালের সঙ্গে চোখাচোখি হলেও খবর।'
'অ্যাঁ! কী কী বললেন?'
'আজ্ঞে, ও কিছু নয়। বড্ড বেশি কথা বলে ফেলি বলে আমার গিন্নিও আমাকে প্রায়ই বকাঝকা করেন। আমাদের কথার দামই বা কী বলুন।'
'দাঁড়ান, দাঁড়ান, বেশি কথা বলেন বটে, কিন্তু হেমন্ত আগরওয়াল বা নটবরলালের নাম তো আপনার জানার কথা নয়!'
'বলেন কী বলাইবাবু! এ নামে কি সত্যিকারের কেউ আছে নাকি? আমি তো জিভের ডগায় যা এল বলে ফেললাম।'
'না মশাই না! ব্যাপারটা এখন আমার কাছে অতটা সোজা মনে হচ্ছে না! ধর্মদাসবাবু একটু ঝেড়ে কাশুন তো!'
'এই দ্যাখো ফ্যাসাদ। কী বলতে কী বলে ফেলেছি, আপনি হয়তো আমার ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। বড়ো মানুষরা রেগে গেলে যে আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের ঘোর বিপদ!'
'ধর্মদাসবাবু, ব্যাপারটা একটু সিরিয়াস কিন্তু।'
'না না বলাইবাবু, আমি আসলে আপনার ভালোর জন্যই বলতে এসেছিলাম যে, আপনি একজন গণ্যমান্য লোক, আপনার কোনো আসোয়াস্তির কারণ ঘটুক এটা আমি চাই না।'
'অসোয়াস্তিটা কীসের?'
'এই যে ওই কুকুরটা আর আমি আপনাকে রোজ ফলো করি, কিন্তু আপনি তা টের পান না এটা যেমন অসোয়াস্তি তেমনি এই আমাদের মতো আরও জনা দুই আপনার পিছু নেয় রোজ। একজন ওই যে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছে, মোটা মতো, ধুতি আর শার্ট পরা। আর একজন ওই যে, দেওয়ালে পোস্টার পড়ছে, লম্বা রোগামতো!'
'আশ্চর্য! ওরা আমাকে রোজ ফলো করে, ঠিক জানেন?'
'আজ্ঞে। তবে হয়তো ওরা চাকরির উমেদার, কিংবা টেন্ডার দিতে চায়, কিংবা হয়তো কোনো ধান্দা আছে। কিংবা এও হতে পারে ওদের কোনো উদ্দেশ্যই নেই।'
'না মশাই, ভাবিয়ে তুললেন।'

'আপনাদের তো এমনিতেই ভাবনাচিন্তার অবধি নেই। সর্বদাই নানারকম সমস্যার মোকাবিলা করছেন। বড়ো কোম্পানি হলে যা হয় আর কী। তাই আমি ভাবলাম, বলাইবাবুর মতো একজন মহান মানুষকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। বিশেষ করে এখন হয়তো আপনি ত্রিশ—বত্রিশ কোটি টাকার একটা ডিল নিয়ে ভারি ভাবনায় আছেন, হয়তো বড়ো বড়ো নানা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন, হয়তো দু—তিনটে শত্রু কোম্পানি আপনাকে নানাভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। সবসময়ে যাকে এতসব সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয় তার কী এইসব ছোটোখাটো ব্যাপারে নজর থাকে!'

'দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। ত্রিশ—বত্রিশ কোটি টাকার ডিলের কথা আপনি জানলেন কী করে, এবং আর যা যা বললেন সেগুলোও তো খুব একটা আন্দাজে ঢিল ছোড়া নয়। ধর্মদাসবাবু, আপনি আসলে কে বলুন তো?'

'আজ্ঞে আমি একজন হোমিয়োপ্যাথ এবং জ্যোতিষী, বলিনি আপনাকে?'

'বলেছেন, কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'আমাকে বিশ্বাস করা উচিতও নয়। আমি প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও মিথ্যে কথা বলে থাকি। তবে কিনা মিথ্যে কথার ফাঁকে ফাঁকে দু—চারটে সত্যি কথাও ঢুকে যায়। চালে কাঁকরের মতোই আর কী! যেগুলো বেছে বের করা মুশকিল।'

'আপনি কী চান স্পষ্ট করে বলবেন?'

'ওরে বাপ রে! আপনার কাছে চাইবার মতো মুখ বা যোগ্যতা কোনোটাই কি আমার আছে? জানি, আপনি এক মহান মানুষ। চাইলেই দিয়ে ফেলবেন। কিন্তু দেখুন, চাওয়ার জন্যও বুকের পাটা লাগে। আমাদের মতো নগণ্য মানুষের তো ওটারই অভাব কিনা।'

'নগণ্য কিনা জানি না, তবে আপনি অতি বিপজ্জনক লোক।'

শক্তিপরীক্ষা

রামরিখ পালোয়ান রাজবাড়ি চলেছে। সেখানে আজ বিরাট শক্তিপরীক্ষা। নানা দেশ থেকে বহু পালোয়ান জড়ো হবে। তারপর কার কত শক্তি তার পরীক্ষা দিতে হবে। কুস্তি—টুস্তি নয়, শুধু যে যতটা পারে নিজের শক্তি দেখাবে, তা যে যেভাবে পারে। রামরিখ ভেবেচিন্তে একটা পাঁচ মন ওজনের লোহার গদা নিয়েছে। এইটে সে বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। গদাটা একটা গোরুর গাড়িতে করে পেছনে আসছে।

রামরিখ আজ ধুতি পরেছে। গায়ে রঙিন জামা, মাথায় পাপড়ি। মাঝে মাঝে গোঁফে তা দিতে দিতে নাগরা জুতোর শব্দ তুলে হাঁটছে। মনে একটু স্ফূর্তি। তার ধারণা, আজকের পরীক্ষায় সে—ই আসর মাত করে আসবে। ওস্তাদকে একশো মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজবাড়ি আর বেশি দূর নয়। দু—খানা গ্রাম পেরোলেই শহর। শহরের মাঝখানে মস্ত রাজবাড়ি। চারদিকে বিশাল অঙ্গন। আজ হাজার হাজার মানুষ পালোয়ানদের দেখতে আসবে।

সামনেই একটা গোরুর গাড়ি যাচ্ছে। গোরুর গাড়িতে একটা বড়োসড়ো চেহারার লোক বসে বসে ঢুলছে। রামরিখ দেখতে পেল গোরুর গাড়িটা রাস্তায় একটা খাদে পড়ে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আটকে গেছে। বলদ দুটো টেনে তুলতে পারছে না। যে লোকটা ঢুলছিল সে একটু বিরক্ত হয়ে নেমে পড়ল। মালকোঁচা মারছে। রামরিখ কাঁধ দিয়ে একটা চাড় মেরে গোরুর গাড়িটা খাদ থেকে তুলে দিয়ে বলল, 'সামান্য কাজ।' মোটাসোটা লোকটা তার দিকে চেয়ে একটু আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'পালোয়ান নাকি তুমি?'

'ওই সামান্য কিছু চর্চা করি আর কী।'

'বেশ, বেশ।' বলে লোকটা একটু হাসল, 'তা তোমার জিনিসপত্র কই?'

'ওই যে, গোরুর গাড়িতে। পাঁচ মন ওজনের গদা।'

লোকটা অবাক হয়ে বলে, 'পাঁচ মন? যাঃ।'

কথা কইতে কইতে পিছনের গোরুর গাড়িটা কাছে চলে এল। রামরিখ গদাটা দেখিয়ে বলল, 'ওই যে।'

লোকটা গদাটা দেখে বলল, 'এটা ফাঁপা জিনিস নয় তো!'

রামরিখ হেসে বলল, 'আরে না, নিরেট লোহার গদা।'

'হতেই পারে না।' বলে লোকটা গদাটা তুলে নিয়ে হাতে নাচিয়ে একটু দেখে নিয়ে হঠাৎ নিজের হাঁটুটা তুলে তার ওপর রেখে দু—হাতের চাড় দিয়ে মচাৎ করে সেটা দু—আধখানা করে ভেঙে ফেলল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, নিরেট জিনিসই বটে হে।'

রামরিখ হাঁ করে চেয়ে রইল। লোহার গদা কেউ ভাঙতে পারে এ তার জানা ছিল না।

লোকটা মুখে একটু দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'সামনের গাঁয়েই কামারশালা আছে, জুড়ে নিয়ো ভাই। অসাবধানে তোমার খেলনাটা ভেঙে ফেলেছি।' বলে লোকটা চলে গেল।'

রামরিখ গদাটা কামারশালায় জুড়ে নিতে গাঁয়ে ঢুকল। একটু চিন্তিত। মনে আর তত স্ফূর্তি নেই। কামার ভীষণ ব্যস্ত। বলল, 'আমার যে গদা জোড়া দেওয়ার সময় নেই।'

রামরিখ করুণ গলায় বলল, 'ভাই, আমি যে রাজবাড়ির শক্তিপরীক্ষায় যাচ্ছি। সময় নেই, একটু করে দাও ভাই।'

কামার খুবই বিরক্ত হয়ে বলল, 'কোথায় তোমার গদা?'

'এই যে!'

কামার গদার টুকরো দুটো দু—হাতে তুলে বলল, 'এইটুকু গদা!' বলে কামারশালার আর এক কোণে অন্তত একশো হাত দূরে যেখানে তার ছোটোছেলেটি কাজ করছিল সেদিকে ছুড়ে দিতে দিতে বলল, 'ওরে বিশে, এ দুটো টুকরো জুড়ে দে তো!'

বিশে একটা টুকরো বাঁ হাতে, অন্যটা ডান হাতে লুফে নিয়ে বলল, 'দিই বাবা।'

রামরিখ অধোবদন হয়ে বসে রইল। গদা জুড়ে নিয়ে রামরিখ ফের যখন রওনা হল তখন তার পা চলছে না। মনটা বড়োই খারাপ।

আর একটা গাঁ পেরোলেই শহর। রাস্তার পাশে কতকগুলো ছেলে ডাংগুলি খেলছিল। কী কারণে তাদের মধ্যে একটু বিবাদ হয়েছে। হঠাৎ একটা ছেলে ছুটে এসে বলল, 'মশাই, আপনার ডান্ডাটা একটু ধার দেবেন? আমরা এই পার্টিটা খেলেই দিয়ে দেব। আমাদের ডান্ডাটা ভেঙে গেল কিনা এইমাত্র।'

বলেই ছেলেটা গদাটা গোরুর গাড়ির ওপর থেকে তুলে নিয়েই ছুট। রামরিখ দাঁড়িয়ে দেখল, ছেলেটা তার গদা দিয়ে গুটি তুলল, তারপর সেই গুটি সত্তর হাত দূরে পাঠাল। গদা দিয়ে এক হাতে দূরত্বটা মাপল। তারপর দৌড়ে এসে ফের গোরুর গাড়িতে গদাটা রেখে ছুটে চলে গেল।

রামরিখ আর এগোল না। গোরুর গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফেরত যেতে লাগল।